৫০, হরি ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ রায়, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

"করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।"

নিবেদন।

ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে আমার জীবনের কিয়দংশ হিমালয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমার সেই লক্ষ্যহীন ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প ছিল না। সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ও মহিষাদলের দীনবান্ধব ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এই বান্ধবদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমার হিমালয়ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করি। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলা ঘোষালের, এবং সাহিত্য-সম্পাদক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উৎসাহে এই ভ্রমণকাহিনীগুলি ভারতী ও সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। শেষ প্রস্তাবটি জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক্ষণে, সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কতিপয় চিত্র সঙ্কলিত করিয়া এই প্রবাস-চিত্র, প্রকাশিত হইল। যদি পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হয়, ভবিষ্যতে আমার অবশিষ্ট ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

সোদরোপম স্নেহভাজন শ্রীমান্ রুড়মল গোয়েনকা, ও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যধিক আগ্রহ না হইলে, এই প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই হয় ত চিরদিন থাকিয়া যাইত। ইতি; ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।

৫০ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট্;
কলিকাতা।

শ্রীজলধর সেন।

প্রবাস-চিত্র।

প্রবাস-যাত্রা।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যে দেশান্তরে যাইতে হইবে, এ চিন্তা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই, এবং অন্য কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, আমার ন্যায় অলস, শান্তিপ্রিয় একটা লোক দুর্গম হিমালয়ের বড় বড় 'চড়াই' ও 'উৎরাই' পার হইয়া পদব্রজে সাধুসন্ন্যাসিগণের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে। কিন্তু অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? দেশত্যাগ করিয়া আমাকে বহু দূর ঘুরিতে হইয়াছিল। চাকরীর উদ্দেশে নয়,—শান্তির অন্বেষণে। শোক-সন্তপ্ত, অধীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দ্দিষ্ট দেশে যাত্রা করিলাম।

প্রথমে যে দিন হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম,—সে অনেক দিনের কথা,—কিন্তু এখনও সে কথা বেশ মনে আছে; দুঃখের দিনের কথা বড় মনে থাকে। সব চেয়ে আমার মনে এই ভাবটি বেশী জাগিতেছিল যে, বাঙ্গালা দেশে আর কখনও ফিরিব না, এবং যাঁহারা আমার আপনার, তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ মুখ আর একবার দেখিবার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার একটি বন্ধু আমাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখখানি ভার; গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িলে, তিনি গাড়ীর দরজা দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন; তখন অধিক কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, এবং কথা কহিয়া মনের আবেগ দূর করা তখনকার পক্ষে অসম্ভব। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; বন্ধুর দিকে শেষবার চাহিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিয়াছিল, আমার চক্ষুও বোধ করি শুষ্ক ছিল না;—একবার মনে হইল, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে, কোন্ দূর দেশে শান্তির কুহকে কেন ছুটিয়া চলিয়াছি; আর যাইব না, নামিয়া পড়ি। তখনই মনে হইল—সকলই মায়া, জীবন বিড়ম্বনাময়,—যদি বন্ধন ছিঁড়িয়াছি, তবে আর কেন?—তখন মনে হইয়াছিল, বন্ধন ছেঁড়া বড়ই সহজ।

অনেক দূরের টিকিট লইয়াছিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গাড়ীতে বসিয়া আমি সেই সুদূরবর্ত্তী পশ্চিম দেশের পর্ব্বত-বেষ্টিত নির্জ্জন গ্রামের চিত্র কল্পনা করিতেছিলাম। নানা দেশের যাত্রীতে গাড়ীখানি পূর্ণ; কিন্তু সেই সমাগত মনুষ্য-

মণ্ডলীর মধ্যে আমি একাকী; আড্ডায় আড্ডায় গাড়ী থামে, লোক উঠে এবং নামে; কিন্তু কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করে না,—"বাপু, তুমি কোথায় যাইবে?" আমারও কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল না। শুধু চিন্তা ভাল লাগে না, এক এক বার একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু সেই জনকোলাহলের মধ্যে একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিবার উৎসাহও ছিল না।

এই সময় কর্ড লাইনে মধুপুরের কাছে একটা পুল ভাঙ্গিয়া পথ খারাপ হইয়াছিল, ডাকগাড়ী ছাড়া অন্য কোনও গাড়ী সে পথে চলিত না। ডাকগাড়ী ভগ্ন সেতুর এ পারে আসিয়া থামিত, ডাক পার হইলে আবার অপর পার হইতে দ্বিতীয় গাড়ী ছাড়া হইত। আমি মিক্সড্ ট্রেণের আরোহী, আমাদের গাড়ী কানুজংশন হইতে দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিল। বামে বা দক্ষিণে কোন দিকেই আমার কিছু আপত্তি ছিল না, এবং এক দিনের স্থানে দুই চারি দিন লাগিলেও আমি নিশ্চিন্ত; কোনও রকমে দিনপাত করা ছাড়া তখন আমার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, লোকজনের ভিড়ও তত বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা, গল্প, হাস্য, পরিহাস, গণ্ডগোল—সে সকলের আর ইয়ত্তা রহিল না। এক জন তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হওয়ার গল্প বলিতেছিলেন; শুনিলাম, তাঁহার সহোদর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রৈণ,

এবং তাহাই তাঁহাদের এই পরিবারিক বিপত্তির কারণ। আর এক জন লোক তাহার অংশীদারকে কিরূপে ফাঁকি দিবে, এক জন সুহৃদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল। এক জন বেঞ্চে হেলান দিয়া গান গাহিতেছিল, হঠাৎ অর্দ্ধপথে গান ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! কল্কেটা একবার দেবেন?" নিকটে আর একটি তাম্রকূটপায়ী কল্কেটাতে একটা দম দিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতে উমেদার ছিল, সে তাহার অধিকারহানির সম্ভাবনা দেখিয়া একটু রাগিয়া চোখ গরম করিয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গায়কবর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দুইটি উৎকট দমে কলিকাসঞ্চিত তামাকটুকু নিঃশেষ করিয়া সেই গরম লোকটার হাতে দিল, এবং পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিল,—

"ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি,
না জানি কোথায় শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী।"—ইত্যাদি।

পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী দুলার কথা মিথ্যা, তবে মস্তকে একটা অনতিদীর্ঘ শিখা দুলিতেছিল বটে, এবং গায়কবর শ্যামদরশনের জন্য কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, শুধু গান শুনিয়া তাহা ঠাহর করা যায় না; কিন্তু সেটি যে, 'ঘোরা তিমিরা রজনী', তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। গ্রীষ্মকালে, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কি দ্বাদশী, এবং তখন রাত্রি ১২ টা, আকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল, সুতরাং ভাল করিয়া নক্ষত্র

দেখা যাইতেছিল না, শুধু স্তব্ধ প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া আমাদের গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল।

একটু ঘুম আসিল। ঘুমের বেশী অপরাধ ছিল না। সেই বেলা ১১ টার সময় গাড়ীতে চড়িয়াছি, রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত সমভাবে বসিয়া লোকের নামা উঠা দেখিতেছি, আর কোলাহল শুনিতেছি; আহারও নাই, নিদ্রাও নাই। এতক্ষণে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে যাত্রীদের গাঁটরীগুলো একটু সরাইয়া জড়সড় ভাবে শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ২টা কি দেড়টার সময়ে, নাম মনে নাই, এমন একটা ষ্টেশনে মাথার কাছে খট্‌খট্ শব্দ হওয়াতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; মাথা তুলিয়া দেখি, আমার কামরার দ্বার ধরিয়া একটা লোক টানাটানি করিতেছে। কামরাটি এখন নিস্তব্ধ, যে ভদ্রলোকটি শ্যাম-দরশনের আশায় হতাশ হইয়া বেহাগ গাহিয়া বিরহজ্বালা মিটাইতেছিলেন, দেখিলাম, আর একটা বেঞ্চে তাঁর মুণ্ডুটা লুটাইতেছে। যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতবীরের ন্যায় যাত্রিদল গাড়ীতে নানারকম ভঙ্গী করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। থার্ডক্ল্যাসের গাড়ী, আলো বেশী নাই, এক কোণে উপরে একটা লণ্ঠন টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহাতে সমস্ত গাড়ী আলোকিত হয় নাই।

গাড়ীর দরজায় চাবি দেওয়া ছিল; কিন্তু যে দরজা ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, সে এক জন পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি। কিছুতে গাড়ী খুলিতে না পারায় সোর গোল করাতে এক জন পুলিসম্যান আসিয়া গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া দিল।

উঠিয়া বসিলাম, বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, ষ্টেশনটী অতি ছোট; আমাদের গাড়ী ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে আসিয়া লাগিয়াছে।

দ্বার খোলা হইলে দেখিলাম, সেই লোকটি একটি যুবতীকে গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিয়া তাহাকে একটু বসিবার যায়গা দিবার জন্য সবিনয়ে আমাকে অনুরোধ করিল। একটি ছোট ছেলে কোলে লইয়া যুবতী গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিলে, সেই লোকটি তাহার লটবহর আনিবার জন্য ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল; ছোট ষ্টেশন, গাড়ী বোধ হয় এখানে দুই এক মিনিটের বেশী থামিবার নিয়ম নাই; সুতরাং তাহার অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িবামাত্র সে লোকটি আমাদের গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, কিন্তু পাঁচ সাত হাত না আসিতেই ষ্টেশনের লোক তাহাকে আটকাইয়া ফেলিল। বেচারা যদি এ দিকে দৌড়িয়া না আসিয়া নিকটে কোনও একটা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহার কোনও অসুবিধাই হইত না, পরের ষ্টেশনে নামিয়া অনায়াসেই আমাদের গাড়ীতে আসিতে পারিত। কিন্তু বিপদ্‌কালে অনেক বুদ্ধিমানের বুদ্ধি লোপ পায়; এক জন নিরক্ষর হিন্দুস্থানী যে এই বিপদে হতভম্ব হইয়া পড়িবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এদিকে গাড়ী ছাড়িল দেখিয়া স্ত্রীলোকটি সেই শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার ইচ্ছায় তাড়া-

তাড়ি দ্বার খুলিয়া ফেলিল। গাড়ীর মধ্যে আর সকলেই নিদ্রিত। এখন আমার কি করা উচিত, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। গৃহস্থের মেয়ে, হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া ফিরানও আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, অথচ আমি হিন্দুস্থানী-ভাষায় যে রকম সুপণ্ডিত, তাহাতে লাফাইয়া পড়িলে তাহার কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করাও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং অগত্যা "কুচ ভয় নেহি," "নেহি নামো" ইত্যাদি দুই চারিটা স্বরচিত হিন্দু-স্থানী কথায় তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দরজাটা সজোরে ধরিয়া রহিলাম। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ও আমাদের পাশের কামরায় দুই চারি জন হিন্দুস্থানী ঘুমাইতেছিল, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দে তাহারা উঠিয়া পড়িল; সকল কথা শুনিয়া তাহারা কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল, এক জন একটা অভদ্রোচিত রসিকতা করিতেও ক্রটী করিল না; যদ্যপিও তাহার সমস্ত রসিকতাটুকুর অর্থ আবিষ্কার করা আমার সাধ্য হয় নাই, তথাপি যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতেই আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল; কিন্তু উপায় নাই, সুতরাং প্রশান্তভাবে সেই নীচরসিকতাটুকু পরিপাক করিতে হইল। মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ছোট-লোকের কাছে ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী আশা করা যায়? "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী," সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানসঙ্গত দুই একটা উপদেশবাক্য প্রয়োগ করাও বাহুল্য বোধ করিলাম।

অনেক কষ্টে স্ত্রীলোকটিকে শান্ত করিয়া বসাইলাম; সে কাঁদিতে লাগিল। একেই আমি হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝি না, তাহার উপর সে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া জড়াইয়া যে সকল কথা বলিতে লাগিল, তাহার একবর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। এইমাত্র বুঝিলাম যে, সে ভাগলপুরের ওপাশে বরিয়ারপুর ষ্টেশনে নামিবে। বরিয়ারপুরের নিকটে তাহার বাপের বাড়ী, যে পুরুষটি গাড়ীতে উঠিতে পারে নাই, সে তাহার বড় ভাই। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, তাহাকে বরিয়ারপুরে নামাইয়া রাখিয়া যাইব। আমার সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও যুবতী এটুকু বুঝিল যে, আমি তাহার শুভানুধ্যায়ী। যুবতীর কোলের ছেলেটি তিন চারি মাসের বেশী হইবে না। স্ত্রীলোকটিকে বিশেষ ব্যাকুল দেখিয়া তাহার ছেলেটিকে আমি কোলে লইয়া বসিলাম; তাহাকে দেখিয়া আর একটি ক্ষুদ্র সুন্দর শিশু ও তাহার স্নেহময়ী মাতার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল—তাহারা আর এ পৃথিবীতে নাই। আমার ক্রোড়ে আসিয়া শিশুটি হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল, শেষে ঘুমাইয়া পড়িল; তখন তাহার মাতার ক্রোড়ে তাহাকে অর্পণ করিলাম।

এ দিকে প্রত্যক ষ্টেশনে গাড়ী থামে, আর আমি মুখ বাড়াইয়া দিই, যদি সেই লোকটি টেলিগ্রাম করিয়া থাকে। ভাগলপুর পার হইয়া গেলাম, তবু কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্রমে গাড়ী বরিয়ারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল।

আমার মনে নানা রকম ভাবনা আসিতে লাগিল। এই সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী ষ্টেশনে নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না; এই রাত্রে যদি সে পথ চিনিয়া যাইতে না পারে, ষ্টেশনের লোকেরা যদি এই অসহায়া যুবতীর উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করে, তাহা হইলে উপায় কি? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, আমি বরিয়ারপুর ষ্টেশনে নামিব। চির দিন নিজের সুখ সচ্ছন্দতা খুঁজিয়া আসিয়াছি, সে সমস্ত শেষ হইয়াছে; এখন আর সে জন্য চিন্তা নাই; এখন এক বার দেখা যাক্, পরকে একটু সুখী করা যায় কি না।

স্ত্রীলোকটির কাছে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। সে আশ্বস্ত এবং সানন্দ মনে আমার পা ধরিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গেল; আমি তাহাকে নিবৃত্ত করিলাম।

বরিয়ারপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ষ্টেশনটি ছোট। স্ত্রীলোকটির ভাই এখানে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু ষ্টেশনের লোকেরা ব্রেকভ্যানের দিক হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই তাহারা আসিতে আসিতে আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম, এবং যুবতীকেও নামাইলাম। ষ্টেশনমাষ্টার আসিয়া আমাদের তারের খবরের কথা বলিল।

ষ্টেশনমাষ্টার লোকটার একটু ইংরাজী বলিবার সথ ছিল; কিন্তু কথাবার্ত্তায় তাহার যেরূপ বিদ্যার দৌড় দেখিলাম, তাহাতে তাহার এ সথটুকু না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু অনেক লোকই আপনাকে সামান্য বলিয়া মনে করে না, সুতরাং এ বেচারীরও দোষ দেওয়া যায় না। সে ইংরাজীতে

আমাকে বলিল, "Don't fear, Babu ; You go Babu, we are here, let her alone, Babu"—আমি বলিলাম, যখন এখানে নামিয়াছি, তখন আজ আর যাইব না।

ষ্টেশনে কর্ম্মচারীর মধ্যে এক ষ্টেশনমাষ্টার, এবং এক জন লোক, সে একাই পুলিসম্যান, মশালচি, টিকিটসংগ্রাহক, কুলি এবং ষ্টেশনমাষ্টারের আরদালী ;—একাধারে সমস্ত। আমার সঙ্গে একটা চামড়ার পোর্টম্যাণ্টো ; পুলিসম্যান ওরফে কুলিশ্রেষ্ঠ সেটি ষ্টেশনের ভিতর লইয়া আসিল। আমি ও ষ্টেশনমাষ্টার আগে, রমণীটি পশ্চাতে ; আমরা ষ্টেশন-ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া তারের খবরটা দেখিতে পাইলাম। মাষ্টারজির সঙ্গে একটু আলাপ হইল, তিনি লোক নিতান্ত মন্দ নন ; আমরা সেই রাত্রি ষ্টেশনে থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলাম। এই স্ত্রীলোকটিকে অপরিচিত স্থানে ছাড়িয়া দিতে সাহস হইল না, অথচ উভয়ে ষ্টেশনের ক্ষুদ্র একটি কক্ষে রাত্রি কাটানোও অকর্ত্তব্য বোধ করিলাম। যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাপের বাড়ী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে ; এ দিকে ভাগলপুর হইতে গাড়ী পরদিন বেলা এগারটার আগে আসিবে না। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী ; শুনিলাম, পথে কোনও ভয় নাই। বাঁধা রাস্তা নাই বটে, কিন্তু ক্ষেতের আইলের উপর দিয়া বেশ যাওয়া যায়। ষ্টেশনের পুলিসম্যানটিকে সঙ্গে যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে ষ্টেশনমাষ্টারের "সবে ধন নীলমণি"—তাহাকে ছাড়িয়া ষ্টেশনমাষ্টারের এক

দণ্ড চলিবার যো নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলাম, ষ্টেশনে বসিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিই; সকালবেলা যুবতীকে তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিব। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আমার অভিপ্রায় শুনিয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিশুটিও কান্না যুড়িয়া দিল। অগত্যা আমি আমার পোর্টম্যাণ্টোটি ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে রওনা হইলাম। এবার যুবতী আমাকে পথ দেখাইয়া চলিল। অনেক রাত্রে জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল; পাতলা মেঘের ভিতর দিয়া সেই জ্যোৎস্না ঘুমন্ত মাঠের বুকে আসিয়া পড়িয়াছে; দূর বনে অল্প অল্প কি নড়িতেছে; দুই একটা পাখী মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে, এবং পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। আমরা দুইটি প্রাণী গ্রাম লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম, রাস্তা প্রায় এক ক্রোশ, কিন্তু চলিতে চলিতে পা ব্যথা করিতে লাগিল, তবুও রাস্তা শেষ হয় না। আমার সন্দেহ হইল, যুবতী বুঝি পথ ভুলিয়াছে। তাহাকে সে কথা বলিলাম; সে হাসিয়া বলিল, "লড়কি কি কখন বাপের বাড়ীর পথ ভোলে?"—এতক্ষণ পরে তাহার মুখে হাসি দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইল।

আমরা যখন যুবতীর পিত্রালয়ে পঁহুছিলাম, তখন ভোর হইয়াছে, তবে চারি দিক বেশ পরিষ্কার হয় নাই। ডাকাডাকি করিতে সকলে উঠিয়া পড়িল। একজন অপরিচিত বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে মেয়েকে আসিতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া

আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মেয়েটি যখন সংক্ষেপে আমার পরিচয় প্রদান করিল, তখন, তাহাদের উপকারের জন্য আমি নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছি শুনিয়া, তাহারা প্রাণ খুলিয়া আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। যুবতীর বাপ এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ; কৃতজ্ঞতাভরে, সে আমার হাত জড়াইয়া ধরিল। আমি আমার সেই সৃষ্টিছাড়া হিন্দুস্থানী ভাষায় তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলাম; বলিলাম, আমার কোন ক্ষতি হয় নাই, তোমার যে উপকার করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আনন্দিত হইয়াছি। ভদ্রলোকে যে এ রকম উপকার করে, তাহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল না। ভদ্রলোকের ভদ্রতাতেও লোকের অবিশ্বাস, এ কতকটা বিস্ময়ের কথা বটে! আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সমস্ত রাত্রি জাগরণ, তাহার উপর এই পরিশ্রম, বিশ্রামের জন্য একটা বিছানা চাহিলাম; তাহারা তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা শয্যা রচনা করিয়া দিল; বিনা বাক্যব্যয়ে আমার শয়ন ও নিদ্রা।

জাগিয়া দেখি, রোদে সমস্ত আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে, বেলা তখন প্রায় দশটা। আমি যেখানে শুইয়াছিলাম, সেখানে আর কেহ ছিল না, কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত অপরিচিত স্থানে নিদ্রা যাওয়াতে কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম; উঠিয়া সসঙ্কোচে বাহিরে আসিয়া দেখি, বারাণ্ডায় সকলে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া পরিবারস্থ সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া স্নান করিয়া

আসিলাম। স্নান শেষ হইতে দেখিলাম, যুবতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যেচোয়া ষ্টেশনে আসিয়া সকল কথা শুনিয়াছিল; কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সে আমার পোর্টম্যাণ্টোটাও বহিয়া আনিয়াছে।

সে দিন তাহারা আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ আর এক দিনও বাস করিবার জন্য আমার হাত পা ধরিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাদের বিনয়পূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। দেখিলাম, তাহারা গরীব বটে, কিন্তু হৃদয়হীন নহে। তাহাদের সংসারে অনেক অভাব থাকিলেও সেখানে শান্তির অপ্রতুল ছিল না; আমার শান্তিহীন হৃদয় এই সন্তুষ্ট ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের মধ্যে আসিয়া যেন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের পাঁচটি ছেলে, আর এই যুবতীই একমাত্র কন্যা। ছেলেগুলি সকলেই পিতার আজ্ঞাবহ, তিনটি ছেলের বিবাহ হইয়াছে; বৃদ্ধা গৃহিণী আছেন। বড় ছেলের সন্তানাদি কিছু হয় নাই, দ্বিতীয় পুত্রের দুইটি সন্তান। মোটের উপর বেশ সুখের সংসার।

আহারাদির পর তাহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের গল্প শুনিতে লাগিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ইহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িলাম। মেয়েরা সকলে আমার সম্মুখে আসিতে কোনও আপত্তি করিল না। এখানে মায়ের স্নেহ, ভায়ের সম্মান, ভগ্নীর আদর, কিছুরই অভাব দেখিলাম না। এক এক বার মনে হইল, এই নিরক্ষর

চাষার পরিবারেই দিন কতক কাটাইয়া যাই; কিন্তু থাকা হইল না; সেই রাত্রেই আমি তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিলাম। মেয়ে ও বধূরা আমার সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল, তখনও আর দুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ! গৃহস্বামীর দুই পুত্র আমার সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিল।

শীঘ্রই লৌহরথ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে প্লাটফরমের উপর আসিয়া থামিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আমার নব-পরিচিত বন্ধুগণের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

গুরুদ্বার।

আজ একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে ইতিহাসপাঠের দুর্দ্দশা অসাধারণ। অনেকে বলেন, উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ; কিন্তু অনেকে এরূপ মতও ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, ইতিহাসপাঠে লোকের তেমন স্পৃহা নাই, তাই এদেশে উৎকৃষ্ট ইতিহাসের অভাব। কোন্ কথাটি সত্য, তাহা সমালোচকগণ আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে এক একটি "হেরোডোটস্" করিয়া তুলিবার পথ পরিষ্কার করুন। "টেক্‌স্‌টবুক কমিটী"র মনোনীত পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে যতটুকু তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমানে আমরা শিক্ষক ও নোটের সাহায্যে ততটুকুমাত্র অতি কটু পদার্থের ন্যায় গলাধঃকরণ করি। কিন্তু বলা বাহুল্য, ইহাতে ফলও সেইরূপ হইয়া থাকে; অর্থাৎ "পাশ" বা "ফেলের" সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল বরণীয় কীর্ত্তির স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। ইহার পর কোনও কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বের কথা উঠিলে, বা কোনও বীরশ্রেষ্ঠের

চরিত্রসম্বন্ধে কিছু আলোচনা উত্থাপিত হইলে, আমরা তামাক টানিতে টানিতে "হাঁ, হাঁ, এমনিতর কি যেন একটা ব্যাপারের কথা ছেলেবেলায় পড়া গিয়াছিল" বলিয়া, মুরুব্বিয়ানার পরিচয় দিই; যেন সে কথাগুলি বাল্যকালেই ভাল সাজিত, এখন আর তাহা লইয়া আলোচনা করা ভাল দেখায় না; বরং তাহা অপেক্ষা তামাক টানিতে টানিতে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সকলের না হউক, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিতের এইরূপ গতি!

বিদেশের, রোম গ্রীসের ইতিহাস দূরে থাকুক, আমাদের গৃহপ্রান্তে, আমাদের নয়নসমক্ষে অবস্থিত যে একটি মহাপরাক্রান্ত জাতির অতুলকীর্ত্তির দুই একটি সামান্য কথামাত্র "টেক্সটবুকে"র সাহায্যে আমরা অবগত হই, সেই অমিতবলশালী, প্রচণ্ডতেজা শিখজাতির ইতিহাসের সহিত আমরা কতটুকু পরিচিত? ইংরাজীতে "কে" সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নানা কারণে তাহা নির্দ্দোষ নহে; হুইলারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহাদের বিড়ম্বনা ততোধিক। বাল্যকালে বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্র ইতিহাসে যাহা লিখিত দেখিতাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। অবশেষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" ও 'শিখ" নামক সুন্দর প্রবন্ধে শিখজাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের অনেক বিবরণ পাঠকসাধারণের গোচর হইয়াছে। রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার গৌরবময় সংগ্রামক্ষেত্রে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোকে

সমগ্র ভারত আভাময় করিয়া তুলিয়াছিল, অপক্ষপাত লেখকের লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, আমাদের এই দুর্ব্বল অসাড় হৃদয়েও মৃদু কম্পন উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডের স্বাধীনতার গৌরবস্বরূপ "মারাথান" ও "থর্ম্মাপলী" স্বাধীন য়ুরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে যে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতার যেরূপ মহাতীর্থরূপে পরিগণিত রহিয়াছে, আমাদের দেশের মারাথন ও থর্ম্মাপলী, আমাদের সুপবিত্র পুণ্যতীর্থ হলদীঘাট, রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালাকে আমরা এখনও সেরূপভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমি ইতিহাসের পাঠক নহি; যতক্ষণ ইতিহাস পড়িব, ততক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলে আমার লাভ আছে; কিন্তু আমি যেখানে থাকিতাম, পাঠ না করিলেও সেখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়নগোচর হইত; এবং সেই সকল ব্যাপার একত্র লিপিবদ্ধ করিলে একখানি সুবৃহৎ সুন্দর ইতিহাস প্রস্তুত হইতে পারে। প্রতিদিন যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন আমার নয়নপথে পতিত হইত, আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না; "ওটা কি একটা ছিল" এইটুকু মাত্র বলিয়াই অনেকের কৌতূহলবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু এই বীরভূমির লুপ্তগৌরবের নীরব শ্মশানে দাঁড়াইয়া আর শুধু "ওটা কি একটা ছিল" বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়; এবং সমস্ত দেখা শেষ হইলে একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ

হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, চক্ষুঃপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসে। পঞ্চনদের প্রাচীন গৌরব অধিক নাই; এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের উপর যে যুগব্যাপী অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি আধিপত্য করিতেছিল, মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে তাহার অবসান হয়, এবং ধর্ম্মবীর নানক তাহার শুকতারা। দেখিতে দেখিতে যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং পঞ্চনদবাসিগণ দীর্ঘনিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। সে আজ কয় দিনের কথা। কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যেই সে সূর্য্য অস্তমিত হইল; শুধু একটা সুখের স্মৃতি, এবং অতীত গৌরবের চিহ্ন চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে; তাহা দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

কিন্তু আমি যে ক্ষুদ্র কাহিনী বলিতে যাইতেছি, ইতিহাসের বিষয় হইলেও, প্রচলিত ছাপার বহিতে সে সম্বন্ধে অধিক কথা দেখা যায় না। মনে হয়, একখানিমাত্র পুস্তকে এ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ দেখিয়াছিলাম; সুতরাং বিষয়টি অধিকাংশ পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হইবে, এরূপ আশা বোধ করি দুরাশা নহে।

দেরাদুন সহরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেই বাজারের নিকট একটি সুবৃহৎ মন্দির সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মন্দির বলিলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, এবং হঠাৎ দেখিলে ইহাকে মন্দির বলিয়া মনে না হইয়া মুসলমান বাদশাহদিগের সমাধিমন্দির বলিয়া বোধ হয়। মনোহর-

কারুকার্য্যময় উচ্চপ্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি স্থান; প্রাচীরের চারি কোণে চারিটি উচ্চ মনুমেণ্টের মত মিনার, এবং পশ্চিমদিকে একটি প্রকাণ্ড সিংহদ্বার,—তাহাতে লৌহ কবাট শোভা পাইতেছে; যেন কত দিনের পুঞ্জীকৃত রহস্য এই কপাটের অন্তরালে গুপ্ত রহিয়াছে। এই মন্দিরের অপর তিন দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আরও তিনটি দ্বার রহিয়াছে; সেগুলি এই লৌহদ্বারের ন্যায় 'সদর দরজা' নহে।

লৌহনির্ম্মিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারা যায়; এই প্রাঙ্গণটি প্রস্তর-মণ্ডিত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মানবের মলিন পদস্পর্শে সেই পরিচ্ছন্নতার ঈষৎ হানি হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও বোধ করি ক্ষণকালের জন্য ইহার নির্ম্মাণকারীর মনে স্থান পায় নাই। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির; মন্দিরের উপর উঠিতে হইলে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়, এবং এই জন্য মন্দিরের চারি দিকে সিঁড়ি চিত্রে ভূষিত; ইহার অভ্যন্তরে কোনও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত নাই; মুসলমানেরা উপাসনা করিবার জন্য যেরূপ মসজিদ প্রস্তুত করেন, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। এই মন্দির শিখগুরু রামরায়ের সমাধিমন্দির, আর এই প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে যে চারিটি মনুমেণ্টের ন্যায় মঞ্চ আছে, তাহা রামরায়ের চারি স্ত্রীর সমাধিস্থান। এই মন্দিরের নাম অনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে,—"গুরুদ্বার" বা "গুরুদেরা"। মন্দিরসম্বন্ধে অন্যান্য

কথা বলিবার পূর্ব্বে, রামরায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র একখানি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারও অবগত আছেন, কি জন্য ধর্ম্মবীর, সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নানকের মন্ত্রশিষ্যেরা কর্ম্মবীর, মহাপরাক্রান্ত দুর্জ্জেয় যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং একটি সংসারবিরাগী, ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্বিরোধ সম্প্রদায় কিরূপে কয়েক জন অবিমৃষ্যকারী মুসলমান সম্রাটের অমানুষ অত্যাচার ও পাশবিক কঠোরতায় উৎপীড়িত হইয়া, সাম্প্রদায়িক ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক সুবিখ্যাত রাজনৈতিক জাতিতে অভ্যুত্থান লাভ করিল। শিখজাতির ক্রমপরিবর্ত্তনের সেই ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে; আমরা এখানে কেবল শিখসম্প্রদায়ের আদিগুরু নানকের তেজস্বী বংশতরুর একটি শাখার ইতিহাস বর্ণন করিব।

রামরায় শিখগুরু; ইনি গুরু হরগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র। যে সময়ে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রভূত ক্ষমতার পীঠস্থান দিল্লীর রত্নসিংহাসন লইয়া, দারা, সুজা, আরঙ্গেব ও মুরাদ, পবিত্র ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় পরস্পরের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবেশ করাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিল, এবং রোগক্লিষ্ট অক্ষম বৃদ্ধ সম্রাট অন্ধকারময় কারাগারের বিষাদময় কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক অনুতপ্তহৃদয়ে প্রতিদিন মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন, সেই অরাজক সময়ে যিনি শিখসম্প্রদায়ের নেতা

ছিলেন, তাঁহার নাম গুরু হররায়; ইনিই রামরায়ের পিতা। গুরু হররায়, বাদশাহ-পুত্রগণের ভ্রাতৃবিরোধে যোগদান করেন, এবং সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র "দারাশেকো"র সহায় হন। যাহা হউক, এই ভ্রাতৃবিরোধের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন; আরঙ্গের ধূর্ত্ততাপ্রভাবে সিংহাসন লাভ করিয়া বিদ্রোহাপরাধে গুরু হররায়কে সপরিবারে দিল্লীতে আবদ্ধ রাখেন। গুরু হররায় কারারুদ্ধ হন নাই বটে, কিন্তু সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত দিল্লী ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এই সময় গুরু রামরায়ের জন্ম হয়, এবং এই দিল্লী নগরেই ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। সিংহশাবক পিঞ্জর মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত; যে স্বাধীনতার উষ্ণ শোণিতস্রোত তাঁহার গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষদিগের ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, গুরু রামরায় জীবনে এক দিনের জন্যও সে স্বাধীনতার মাধুর্য্য আস্বাদনের অবসর পান নাই; দিল্লী তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিলাসিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরশ্রেণীর মধ্যে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বিরাজিত ছিল, মোগলসাম্রাজ্য তখন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ়, এবং তাহার বিশাল বীর্য্য, অখণ্ড প্রতাপ, অসীম অর্থগৌরব, এবং অনিয়ন্ত্রিত আনন্দোৎসব ও উচ্ছ্বসিত হর্ষকোলাহল, সেই জনাকীর্ণ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যবহুল রাজধানী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই উৎসবময় নাট্যশালায় উপবিষ্ট হইয়া, বিস্মিতপ্রায় দর্শকের ন্যায় গুরু রামরায় কিছুতেই বুঝিতে পারেন

নাই, কর্ম্মস্রোত কি গভীর গর্জ্জনে তাঁহার পিতৃভূমি পঞ্চনদের পুণ্যপ্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উপর কূটবুদ্ধি সম্রাট আরঙ্গেবের স্নেহ ও যত্ন তাঁহার পিতৃস্নেহের স্থান পূর্ণ করিল, তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম বাদশাহপুত্রগণ অপেক্ষা ন্যূন রহিল না, সুতরাং বালক দিল্লীশ্বরের সুবর্ণশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এক দিন এ জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল; এক দিন তিনি এ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অভীষ্টপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। শিখজাতির হৃদয় হইতে, বিশ্বাস ও ভক্তি হইতে তখন তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত; তাই রাজপ্রাসাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে নাই। অবশেষে তিনি বিলাসের কাম্যকানন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের একটি নির্জ্জন নেপথ্যে উপস্থিত হইয়া উদাসভাবে জীবনযাপন করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

আরঙ্গেব যতই কূটবুদ্ধি ও ধূর্ত্ত হউন, তথাপি তিনি মানব; মানবসুলভ ভ্রমজাল হইতে মুক্ত থাকা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। যে অভিপ্রায়ে তিনি রামরায়ের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, যাঁহারা সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ক্রূরচেতা আরঙ্গেবের সেই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত। স্নেহের অনুরোধে স্নেহ করা, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যত্ন বা আদর করা, আরঙ্গেবের স্বভাবে বা কার্য্যে কখনও দেখা যাইত না; স্নেহ, মমতা, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি তাঁহার শঠতাময়

অভিপ্রায়সিদ্ধির প্রধান সহায় ছিল; সুবিধা বুঝিয়া তিনি অপরকে যত্ন করিতেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি পরের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তাহার পর কার্য্য সফল হইলে, সেই হতভাগ্যদিগকে কীটের ন্যায় পদতলে দলিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দিল্লীর বাহ্যদৃশ্য যতই উজ্জ্বল ও উৎসবপূর্ণ থাক, এবং দিল্লীর পুষ্পসমাচ্ছন্ন রত্নরাজিপরিশোভিত রাজপ্রাসাদে অপ্সরোসদৃশী সুন্দরীবৃন্দের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে যতই হর্ষ ক্ষরিত হউক, সম্রাট আরঙ্গেবের হৃদয় চিন্তা কিম্বা ভয়শূন্য ছিল না। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে রাজপুত জাতি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃততর হইয়া বিপুল মোগলসাম্রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল; তাহার উপর যদি পঞ্চনদের এই যুদ্ধকুশল পরাক্রান্ত বীরজাতি মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনে যত্নবান হয়, তাহা হইলে পতন অনিবার্য্য, এই মনে করিয়াই ক্রূরচেতা সম্রাট আরঙ্গেব রামরায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বৃথা হইয়াছিল। শিখেরা রামরায়কে গুরুপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিলেন; শিখ সম্প্রদায় এখন মুসলমান সম্রাটের শত্রু, সুতরাং গুরুপুত্র হইলেও আরঙ্গেবের বন্ধুকে তাঁহারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। সত্য বটে, এক দিন তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, বিনীত সাধুসম্প্রদায় ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ম্মপ্রাণ, মহাযোদ্ধা, অমিত-

তেজো বীরজাতি; শান্তস্বভাব ধার্ম্মিক রামরায়কে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা হরিকিষণকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এই শিশু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করায়, রামরায় শিখসম্প্রদায়ের গুরুপদলাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিখসমাজে প্রবেশদ্বার চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। হরিকিষণের মৃত্যুর পর, শিখেরা একমত হইয়া গুরু হরগোবিন্দের পুত্র, মহাতেজস্বী, স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাবীর তেগবাহাদুরকে গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তেগবাহাদুর সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শিখগুরুর খ্যাতি, শিখপরাক্রমের প্রতিষ্ঠাতা গুরুগোবিন্দ সিংহ ভিন্ন সকলের অপেক্ষাই অধিক। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের তীক্ষ্ণ তরবারীতে তেগবাহাদুরের ছিন্ন শির ধূলিলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই শোণিতস্রোত বৃথা প্রবাহিত হয় নাই; তাহা শিখজাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-অনলে আহুতিস্বরূপ হইল। অবশেষে তেগবাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দ সিংহ শিখ জাতির হৃদয়ে যে অভিনব শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, তাহা মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ডের পর গুরু রামরায় আর একবার গুরুপদপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার তৃতীয় উদ্যম। ক্রমাগত তিন বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন, শিখেরা এবারও পূর্ব্ববারের ন্যায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দ সিংহকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গোবিন্দ সিংহের ন্যায় কয় জন

লোক এ পর্য্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? পৌরাণিক ভারতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আধুনিক ভারতের চারি জন মহাপুরুষকে স্বদেশহিতৈষী বীরের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে; এই চারি জন—প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এবং রণজিৎ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ শিখগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইলে রামরায়ের সমস্ত আশা বিদূরিত হইল; তিনি বুঝিলেন, এই নবদীক্ষিত যুদ্ধনিরত জাতির গুরুগিরি করা তাঁহার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি উদাসীনের কর্ম্ম নহে। তিনি স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং গুরু নানকের নামে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। লোকালয়ের বিচিত্র কলরবের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাই নির্জ্জনবাসে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজার নামে একখানি অনুরোধপত্র লইয়া, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। গাড়োয়ালরাজ তাঁহাকে সশিষ্যে দেরাদুনে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে তিনি প্রথমে টনস্ নদীর তীরে 'কাণ্ডলী' নামক একটি নির্জ্জন স্থানে কিছু দিন বাস করেন। এই স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, (এখন আর নাই, অতি অল্প দিন হইল, বিনষ্ট হইয়াছে।) জনরব, তিনি স্বহস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধিক দিন এখানে বাস করা তাঁহার অনভি-

প্রেত হওয়ায়, 'খামুওয়ালা'তে তিনি এই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন; 'খামুওয়ালা' এখন দেরাদূন নগরের মধ্যে পড়িয়াছে।

এই স্থানে মন্দির স্থাপিত হইলে, নানাদিগ্দেশ হইতে দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। শোকতাপে জর্জ্জরিত, ব্যথিতহৃদয় নরনারীগণ তাঁহার পবিত্র উপদেশে হৃদয় সংযত করিবার জন্ত তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইল, এবং ধীরে ধীরে দেরাদূন সহর সংস্থাপিত হইল। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'গুরুদ্বার' বা গুরুদেরা,' ক্রমে ক্রমে 'গুরু' লোপ পাইয়া, ইহা 'দেরা' নামেই প্রসিদ্ধ হইল, ও 'দূন' প্রদেশে অবস্থানের জন্ত 'দেরাদূন' এই পূর্ণ নাম গ্রহণ করিল। কিন্তু 'দেরাদূন' নাম এইরূপে উৎপন্ন হইলেও, ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সাধারণ লোকে এই স্থানকে 'দ্রোণকা ডেরা' অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের আচার্য্য দ্রোণের 'দেরা' বা বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এবং তাহাদের মতে এই জন্তই এ প্রদেশের নাম 'দূন' হইয়াছে। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্ মতটি যথার্থ, ঠিক বলা কঠিন; তবে যাঁহারা মহাভারতোক্ত ঘটনাকে একটা রূপক জ্ঞান করিয়া কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষক সেই বৃদ্ধ গুরুটিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের নিকট প্রথমোক্ত মতই আদরণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য

দেরাদূনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, রামরায় আর কখনও শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদলাভের চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার শিষ্যশ্রেণী 'উদাসী সাধু' নামে প্রসিদ্ধ। গুরু নানকের নামে তিনি যে সাধুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন, পঞ্জাবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোকও দেখা যায়।

গাড়োয়ালের রাজা ফতে শা এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই সময় চারিখানি গ্রাম দান করেন। প্রথমে এই গ্রাম কয়েকখানি হইতে যে আয় হইত, তাহা অধিক ছিল না; কিন্তু এখন তাহার যথেষ্ট আয় হইয়াছে। গুরুদ্বারের মোহন্তই এখন দেরাদুনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী ও পদস্থ ব্যক্তি। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহাদিগকে সাতখানি গ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিহরীর রাজার নিকটও তাঁহারা ছয়খানি গ্রাম লাভ করিয়াছেন।

অনেক দিন হইল, এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এবং তাহার কোনও প্রকার অবস্থান্তর ঘটে নাই। আর যদি কখনও ইহার জীর্ণ-সংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের মন্দিরসংস্কারের জন্য যেরূপ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইতে হইয়াছে সেরূপ ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যক হইবে না। গুরুদ্বারের অর্থ-গৌরব এবং সম্পত্তির ইয়ত্তা নাই; তবুও ইহা পরিমিত-সংখ্যক শিখ ও উদাসী সন্ন্যাসিগণের পুণ্য তীর্থমাত্র। আর আমাদের পুরুষোত্তম আট কোটী বঙ্গবাসীর এক মহাতীর্থ; শুধু বঙ্গবাসী কেন, উৎকল, বিহার, উত্তর-পশ্চিম, ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই অগণ্য ভক্ত, অসংখ্য পাপী তাপী প্রতি

বৎসর জলস্রোতের ন্যায়, শত শত ক্রোশ বিস্তৃত দুরতিক্রমণীয় পথ অক্লান্তভাবে অতিক্রম করিয়া, বঙ্গসাগরোপকূলবর্ত্তী এই মহাতীর্থে সমাগত হইয়া, জগন্নাথের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জীবন পবিত্র করিয়া লয়! বিধাতার বিড়ম্বনা! আজ সভাস্থলে ক্ষীণকণ্ঠে সেই জগন্নাথদেবের প্রাচীন মন্দিরের গৌরবকাহিনী ঘোষণাপূর্ব্বক মন্দিরসংস্কারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

গুরুদ্বারের মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী বর্ত্তমান। এদেশে পুষ্করিণী খনন করা বিলক্ষণ কষ্টকর ও অর্থসাধ্য ব্যাপার; এই জন্য এখানে প্রায়ই পুষ্করিণী দেখা দেখা যায় না। এই পুষ্করিণীর জল অভ্যন্তরস্থ প্রস্রবণ হইতে সমুদ্ভূত নহে, রাজপুর খাল হইতে এই জল আনয়ন করা হয়। এই পুষ্করিণীতে নানাবিধ মৎস্য আছে।

প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র এখানে একটি মেলা হয়, তাহার নাম "ঝাণ্ডার মেলা"। "ঝাণ্ডা" কথাটির অর্থ আগে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। সন্ন্যাসীদিগের হস্তে এক গাছি করিয়া লাঠী থাকে; কোনও স্থানে বাস করিতে হইলে তাহারা প্রথমে সেইখানে লাঠী প্রোথিত করে, এবং তাহার অগ্রভাগে নিশানের মত এক খণ্ড লালকাপড় বাঁধিয়া দেয় ও তাহার পর সেখানে আসন পাতে। আমাদের দেশেও কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ফকিরের মধ্যে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু রামরায়ও চৈত্র মাসের প্রথম দিনে এখানে আসিয়া আড্ডা করেন ও ঝাণ্ডাস্থাপন করেন। সেই উপলক্ষে এখনও

প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। এখন পঞ্জাব হইতে দলে দলে শিখেরা আসিয়া এই "ঝাণ্ডার মেলা" দেখিয়া ও গুরু রামরায়ের "ঝাণ্ডা" নামাইয়া উঠাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। রামরায়ের সেই 'ঝাণ্ডা' এখন আর ক্ষুদ্র লাঠী নাই, বৃহৎ জাহাজের মাস্তুলের মত একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হইয়াছে; তাহার সর্ব্বশরীর লাল বস্ত্রখণ্ডে মণ্ডিত, শিরোদেশে সমুজ্জ্বল লোহিত নিশান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার সুবিধা নাই; সিংহদ্বারের সম্মুখে পুষ্করিণীতীরে প্রায় ১৫। ২০ হস্ত উচ্চ স্থান ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান হইয়াছে; তাহারই ভিতর সেই প্রকাণ্ডকায় 'ঝাণ্ডা' দণ্ডায়মান থাকে। প্রতি বৎসর তাহার এক পার্শ্বের ইষ্টকস্তূপ ভাঙ্গিয়া ঝাণ্ডা নামান হয়, এবং যদি সেই কাষ্ঠ-দণ্ডের অবস্থা ভাল থাকে, তবে তাহার গাত্রেই নূতন লাল কাপড় জড়াইয়া নূতন নিশান খাটাইয়া 'ঝাণ্ডা' উঠান হয়, নতুবা কাষ্ঠদণ্ড বদলাইয়া দিতে হয়। ঝাণ্ডা তুলিবার সময়ের দৃশ্য অতি চমৎকার; আমাদের দেশে এমন উত্তেজনাপূর্ণ কোনও উৎসবই নাই, এবং অতি অল্পসংখ্যক উৎসব উপ-লক্ষেই বিদেশ হইতে এত জনসমাগম হইয়া থাকে।

১লা চৈত্রের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে, সহস্র সহস্র নরনারী ঝাণ্ডাতলে সমবেত হইতে আরম্ভ করে; সকলের মুখ প্রফুল্ল, এবং সর্ব্বশরীর অবস্থানুরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত। ক্রমে ঝাণ্ডা তুলিবার সময় হইলে মন্দিরের মহান্ত সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকগণ উৎসাহে "জয়

গুরুজি কি জয়" শব্দে কর্ণ বধির ও আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঝাণ্ডা নামাইয়া ফেলে। তাহার অল্প ক্ষণ পরে সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার সেই 'ঝাণ্ডা' পূর্ব্ব স্থানে সংস্থাপিত করে; অনন্তর প্রত্যেকে 'ঝাণ্ডার' গাত্রে 'রাখি' বাঁধিয়া দেয়। গুরুদ্বারের মহান্ত সেদিন অনাহারে, গলে উত্তরীয় বাঁধিয়া, নগ্নপদে, কৃতাঞ্জলিপুটে, ঝাণ্ডার নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। যে মহান্ত মঠপ্রান্তে পদার্পণ করিতেও অপমান বোধ করেন, যাঁহার মস্তকে ছত্রধারণের জন্য এবং পদতলে পাদুকাপ্রদানের নিমিত্ত শত শত ব্যক্তি সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করে, আজ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীনবেশে, বিনীত ভাবে, গললগ্নীকৃতবাসে ঝাণ্ডার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আজ জনসাধারণের মধ্যে তিনি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দূরে দাঁড়াইয়া আমি এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। আমার মনে হইল, বিধাতার সিংহাসনের সম্মুখেও বুঝি এই নিয়ম; সমদর্শিতাই বুঝি সেখানকার অলঙ্কার, এবং সেই সুখস্বর্গে অহঙ্কার ও অবিনীত ভাব লইয়া মানবের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেই দিনের পবিত্র দৃশ্য চিরকাল আমার মনে থাকিবে।

এক বৎসর এমন হইয়াছিল যে, 'ঝাণ্ডা' আর কিছুতেই তুলিতে পারা যায় না; যাহারা ইহা তুলিবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতেছিল, তাহারা আমাদের মত দুর্ব্বল নহে, এক একটা অসুরের মত বলবান। সহস্র সহস্র লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ঝাণ্ডা উঠাইতে পারিল না, তখন সেই উৎসবক্ষেত্রে সমাগত ভক্ত নরনারীর মধ্য হইতে একটা

ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল; এবং এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলেই ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বয়ং মহান্তজী (বয়স ৩০। ৩৫ বৎসর) আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে আরও অধিক ভীত হইয়া পড়িল; হাহাকারধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; সকলের মুখেই বিষাদকালিমা পরিব্যাপ্ত। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে উৎসবক্ষেত্র আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা যেন তরঙ্গায়িত শোকসাগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "হো গুরুজী, হো গুরুজী!" অর্ণবযান সমুদ্রমধ্যে বিপথগামী হইলে, বা ঝঞ্ঝাবাতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম ঘটিলে, যেমন বিপন্ন আরোহিগণ আকুলভাবে পোতচালকের মুখে একটি আশ্বাসবাণী শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে, এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাঁহার মিনতি করে, এই সমাগত দর্শক ও ভক্তগণের অবস্থাও সেইরূপ। কিন্তু কে তাহাদিগকে আশ্বাসবাণী দিবে? মহান্ত নিজে মুহ্যমান।

যাহা হউক, চেষ্টার ক্রটি হইল না; ক্রমে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল; কিন্তু এতগুলি লোক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই 'ঝাণ্ডা' উঠাইতে পারিল না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি শক্ত, স্থূল কাছি ধরিয়া উন্মত্ত ভক্তগণ টানাটানি করে, আর সেগুলি জীর্ণসূত্রের মত ছিঁড়িয়া যায়। আর উপায় নাই; সকলের বিশ্বাস হইল, গুরুজীর অকৃপা হইয়াছে; নতুবা 'ঝাণ্ডা' এমন

বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধারণ করিবে কেন? অনেকে বলিতে লাগিল, হয় ত মহান্ত মহাশয়ের সেবার ত্রুটি হইয়াছে, তাই এ বিপদ। কেহ কেহ মহান্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা মহান্তকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিয়া নূতন মহান্ত নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিল।

অবশেষে মহান্ত মহাশয় উন্মত্তের মত হইয়া সেই জনতার চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; রৌদ্রে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার উপর নিরাশা ও বিষাদের মলিনতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেকেই সন্তপ্ত হইল, তাঁহার উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সকলে আর একবার অগ্রসর হইল, শরীরের সমস্ত বল এবং প্রাণের সমস্ত ভক্তি নিয়োজিত করিয়া স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, আর একবার 'ঝাণ্ডা' উঠাইবার জন্য টানাটানি করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝাণ্ডা উঠিয়া গেল। সহসা সেই বিষাদাচ্ছন্ন জনস্রোতের মধ্যে যে আনন্দকল্লোল উত্থিত হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়; উৎসাহে সকলে "জয় গুরুজী কি জয়!" রবে আকাশ বিদীর্ণ করিল; এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া দুর্ব্বলপ্রাণ, উৎসাহহীন বাঙ্গালী যে আমি, আমার হৃদয়ও যেন এই বীরজাতির ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল; আমিও তাহাদের সঙ্গে সমস্বরে "জয় গুরুজী কি জয়!" বলিয়া উঠিলাম।

এই দিনে মহান্তের বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়; সকলেই তাঁহাকে প্রণামী দেয়। গুরুদ্বারে নিত্য অতিথিসেবা আছে।

'ঝাণ্ডা' মেলার ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে অহোরাত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে গান হয়; দলে দলে গায়কেরা চারি দিকে গান করিতেছে, দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে, এক দল আসিতেছে; লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পায় না, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; আমাদের দেশের ন্যায় জুতা চুরী যাইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

গুরুদ্বার এবং ঝাণ্ডার কথা কিছু কিছু বলা হইল। গুরু রামরায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রামরায় মধ্যে মধ্যে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই তিন দিন ধরিয়া তাহার অভ্যন্তরেই বাস করিতেন; ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিতেন, সুতরাং অন্য কেহই সে ঘরে যাইতে পারিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় তিনি যোগবলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একবার তিনি তাঁহার চারি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি সপ্তাহকাল গৃহমধ্যে থাকিবেন, এই সময়ের মধ্যে যেন কেহ তাঁহাকে না ডাকে। প্রথম চারি দিন এক ভাবেই অতিবাহিত হইল। কিন্তু গৃহমধ্যে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন; পঞ্চম দিনে তাঁহার পতিপ্রাণা তৃতীয়া স্ত্রী আর থাকিতে পারিলেন না। ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গুরুজী যোগাসনে বসিয়া আছেন, চক্ষু নিমীলিত, মুখে প্রসন্ন ভাব বিরাজিত,

কিন্তু দেহ স্পন্দহীন, দেহে প্রাণ নাই। চারি দিকে হাহাকার রব উঠিল; সকলেই বুঝিল, দেহে প্রাণ আর ফিরিয়া আসিবে না; তাঁহার ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

রামরায় যে আসনে বসিয়া যোগমগ্ন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন, সেই আসন এই মন্দিরমধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। গুরুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা পত্নী মতো পঞ্জাব কুঙার সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন; অবশেষে গুরুজীর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হরপ্রসাদ, মহান্ত পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে নিয়ম হয় যে, মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য মহান্ত হইবেন। বর্ত্তমান মহান্তের নাম প্রয়াগদাস; এই যুবক মঠধারী কোনও কোনও মহান্তের ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষ না হইলেও, বিলাসিতাশূন্য নহেন। যে দেবসম্মান ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইঁহারা প্রতিপালিত, তাহাতে বিলাসী হওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরং বিলাসশূন্য হওয়াই বিচিত্র। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে মঠ সংস্থাপিত করেন, তাঁহারা প্রায়ই অনাসক্ত যোগী, কিন্তু পরবর্ত্তী মহান্তেরা সেই সকল মহৎপ্রকৃতি গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও, তাঁহাদের অলৌকিক গুণগ্রাম, অবিচল একনিষ্ঠা এবং একান্ত নির্লেপ লাভ করিতে পারেন না। বিবিধ কামনা কঠোরতার আবরণের অভ্যন্তরে সামান্য বহ্নিকণার ন্যায় লুকায়িত থাকে; এবং কালক্রমে তাহা প্রজ্জলিত হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করে, এবং তাহাতে মঠের পবিত্রতা, গৌরব সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। গুরুদেবের এই মঠ সম্বন্ধে অবশ্য এতখানি কথা বলা যায়

না; কারণ, এই মঠ বঙ্গদেশে নহে, এবং এই স্বাধীনপ্রকৃতি বীরজাতির মধ্যে এখনও ইহার অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। বিবাদ বিসংবাদে, কিম্বা মামলা মকদ্দমায় ইহার অর্থভাণ্ডার শূন্য হইবার এখনও কোনও কারণ ঘটে নাই; কিন্তু পূর্ব্বের সেই ভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস এখন আর নাই। তবে শিখজাতির মঠ, তাই ইহা হইতে এখনও প্রাণ অন্তর্হিত হয় নাই; হইলে আমাদের দেশের মঠগুলির ন্যায় ইহা ধর্ম্মমহিমার স্থায়ী উপহাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

নালাপাণি।

'নালাপাণি' নামটি শুনিলে সহজেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। 'নালা' অর্থ পয়ঃপ্রণালী, আর 'পাণি' অর্থ জল; এই দুইটি শব্দ একত্র করিয়া অর্থনিষ্কাশন করিলে খালের জল ছাড়া যে আর কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায় না, তাহা বোধ করি অধ্যাত্মবাদিগণও অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকও নালাপাণির অন্য কোনও অর্থ নাই।

হিমালয় পর্ব্বতের একটি নিম্ন পাহাড় হইতে এই নির্ঝরটি নির্গত হইয়াছে। এই ঝরণার জল এমন পরিষ্কার ও সুস্বাদু যে, তাহার সহিত কলিকাতার কলের জলেরও তুলনা হইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন এ জলের এমন একটি গুণ আছে, যে জন্য দরিদ্র লোক বিশেষ কৃতজ্ঞ না হইলেও, অলস ধনী ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত জীবন্মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্গের সুধার সহিত এই জলের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারে না। এ জল অসম্ভব ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; যে দিনান্তে একবারও উদর পরিতৃপ্ত করিবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ক্ষুধার বৃদ্ধি কষ্টকর, বরং ক্ষুধা হ্রাস করিবার কোনও উপায় থাকিলে

তাহার উপকার হয়। কিন্তু যে সকল ধনিসন্তান পিতৃপিতা-মহের উপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া দিবারাত্রি বিলাসসাগরে ডুবিয়া আছেন, এবং প্রতিদিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মুখে নিজ কথার পুনরুক্তি শুনিতে শুনিতে তাকিয়ার উপর ভর দিয়া অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন, এবং দিবাবসানে স্ফীতোদরের সুবিস্তীর্ণ পরিধিতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলেন, "আজ ক্ষিদেটা বড় মন্দা হে!"—নালাপাণির জল তাঁহাদের সেই ক্ষুধাহীনতা রোগের মহৌষধ; ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন নাই, এক এক গণ্ডুষ তুলিয়া খাইলেই হইল, উদরাগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা কার্য্যকর হয়, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত খাদ্য জীর্ণ হইয়া যায়; অম্ল রোগেরও এই জল অব্যর্থ ঔষধ।

যে স্থান হইতে এই ঝরণা বাহির হইয়াছে, সেই পাহাড়ের নামও নালাপাণি, এবং গ্রামের নামও নালাপাণি হইয়াছে। গ্রাম বলিলে পাহাড়ে গ্রামের যাহা অর্থ, তাহাই বুঝিতে হইবে;—সেই আট দশ বিঘা জমীর উপর দশ পনের ঘর অধিবাসী; সংখ্যা খুব বেশী হইলেও পঁচিশ ঘরের অধিক হইবে না; ইহাদের অধিকাংশই নেপালী গুরখা।

এই নালাপাণিতে দুইখানি দোকান আছে; একখানিতে আটা, ডাইল, লবণ, ঘৃত, লঙ্কা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রীত হয়, আর একখানিতে সদাশয় ইংরাজ গবর্মেণ্টের সযত্নরক্ষিত, গৌরববাহিনী, বিপুল-অর্থ-প্রদায়িনী

সুরা বিক্রীত হয়। পর্ব্বতের মধ্যে ২৫। ৩০ ঘর গৃহস্থের জন্য পুণ্যসলিলা নালাপাণির পার্শ্বেই, সত্যসত্যই যে স্থান হইতে নালাপাণির ঝরণা বাহির হইয়াছে, তাহারই গাত্রে সংলগ্ন মদ্যালয়। যে দিন এই সুন্দর স্থানে, এমন পরিষ্কার, সুস্বাদু, সুপেয় নির্ম্মল জলের উৎস-সন্নিকটে এই মদের দোকান দেখিয়াছিলাম, সেই দিন পানদোষনিবারণের জন্য উৎসর্গীকৃতজীবন, লোলচর্ম্ম, পক্ককেশ, ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ইভান্স সাহেবের সৌম্য মূর্ত্তি আমার নয়নসমক্ষে উদিত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে তাঁহার জলদগম্ভীর কথাগুলির প্রতিধ্বনি যেন শুনিতে লাগিলাম। বহুদূরবর্ত্তী, হিমাচলক্রোড়স্থিত দেরাদুনের মিশন স্কুলের প্রকাণ্ড হল কম্পিত করিয়া বৃদ্ধ পরম-উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে যে হৃদয়স্পর্শী কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে আজও যেন তাহা কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে; বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "দারু মৎ পিয়ো, খোদা গঙ্গাজীমে দারু নেহি ঢাল দিয়া, ইয়ে বহুৎ মিঠা পাণি ঢাল দিয়া, গঙ্গাজীকো পাণি ছোড়কে কাহে দারু পিতে হো!"—হায়, পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের এ কথা বুঝাইতেগিয়াছ, তাহারা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত বর্ব্বর, নতুবা তোমার এই মধুর উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না? এখনো ত দ্বিগুণ উৎসাহে মদ্য বিক্রীত হইতেছে। মানুষ যখন দিক্-বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়, তখন বুঝি দেবতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। পশুত্বের নিকট দেবশক্তিও ব্যর্থ?

দেরাদুন হইতে এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে নালাপাণির

পাহাড়। দেরাদুনের মধ্য দিয়া দুইটি 'নহর' (পয়ঃপ্রণালী) বহিয়া যাইতেছে। মসুরী পাহাড়ের পাদদেশে রাজপুর নামে একটি স্থান আছে। রাজপুরের একটা প্রকাণ্ড ঝরণাকে বাঁধিয়া রাজপুর হইতে দেরাদুনের রাস্তার পাশ দিয়া একেবারে নগরের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। নগরের বাহির হইতেই তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ কর্ণপুর নামক স্থান দিয়া ও অন্য ভাগ বাজারের পাশ দিয়া, প্রবাহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি নহরের জলেই সহরের সমস্ত কাজ চলে, এতদ্ভিন্ন এই নহরের সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ীর যোগ আছে কিছু পয়সা খরচ করিলে, পয়সার অনুপাতে একঘণ্টা বা আধ ঘণ্টার জন্য, যাহার যতখানি দরকার, বাগানের কি অন্য কোনও ব্যবহারের জন্য ততখানি জল পাইতে পারে। এই জল যথারীতি যোগাইবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, এবং তাহাদের আফিসও আছে, পূর্ব্বে লোকে এই নহরের জলই পান করিত, কিন্তু এ জলের একটি মহৎ দোষ আছে। এই জল পান করিলে লোকের গলা ফুলিয়া যায়, এই জন্য যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা লোক জনের দ্বারা দূরস্থ অন্য কোনও ভাল ঝরণা হইতে জল আনাইয়া পান করে। নালাপাণির এই জল আবিষ্কৃত হইলে কিছু দিন পর্য্যন্ত নগরের লোক ইহা আনাইয়া লইত, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সকলে আনাইতে পারিত না; পরে মিউনিসিপালিটী মাটীর নীচে পাইপ বসাইয়া নগরের মধ্যে জল আনিয়াছেন, এবং দেরাদুনের প্রশস্ত Parade groundএর দুই প্রান্তে

দুইটি ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গায়ে নল বসাইয়াছেন। সকলে সেই নলের মুখ হইতে বিনা পয়সায় নালাপাণির জল লইয়া যায়; নালাপাণির জল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু এই জল ভিন্ন আরও কতকগুলি কারণে নালাপাণি প্রসিদ্ধ। নালাপাণিতে এক জন সন্ন্যাসীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে; এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসীর দল হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকৃতির, ইনি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী। আর্য্য ধর্ম্মের অর্থ—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত ধর্ম্ম; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের অনেক শিক্ষিত লোক এই ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী বা সাধুশ্রেণীর মধ্যে যে এই ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছে, আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না। বিশেষতঃ, নানা কারণে সন্ন্যাসিদিগের উদার মত একটু বিস্ময়-উৎপাদক, তাই এই সন্ন্যাসিবরকে আমার বহুদিন হইতে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এত দিন সে আশা পূর্ণ হয় নাই। শুনিয়াছি, ইনি খুব পণ্ডিত এবং দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী; ইনি মধ্যে মধ্যে দেরাদুন আর্য্যসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত হন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাপি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হই নাই; কারণ, তিনি কোন্ দিন আসিবেন, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় থাকিত না।

সুতরাং সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হওয়াতে, এক দিন অপরাহ্নে আমি আমার জনৈক দীর্ঘকালপ্রবাসী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নালাপাণিদর্শনে যাত্রা

করিলাম। নালাপাণির পথে একটু অগ্রসর হইলেই একটি শুষ্ক নদী পার হইতে হয় ;—এই নদীর নাম রিচপানা। এই নদীর ধারে চুন প্রস্তুতের আড্ডা ; এই নদীর মধ্যে এবং আশে পাশে অনেক 'চূনাপাথর' পাওয়া যায় ; শীতের সময় ব্যবসায়িগণ সেই সকল পাথর কুড়াইয়া একত্র করে, তাহার পর বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে স্তরে স্তরে কাঠ ও ঐ পাথর সাজাইয়া রাখে, শেষে তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়। সমস্ত পুড়িয়া গেলে, গর্ত্ত হইতে সেগুলি তুলিলে দেখা যায়, পাথরগুলি অতি সুন্দর পরিষ্কার চূণে পরিণত হইয়াছে। এই 'রিচপানা' নদী পার হইয়া সামান্য দূরেই আমাদের শ্মশানক্ষেত্র। শ্মশানভূমির পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এ ক্ষেত্রে আমি অনেকবার আসিয়াছি ; কত দিন সন্ধ্যার সময় ইহার নীরব গম্ভীর ভাব দেখিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কত কথা চিন্তা করিয়াছি। দুই একবার আমার আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ও প্রীতির অবলম্বন স্ত্রী ও পুত্র কন্যার অন্তিমকার্য্য শেষ করিতে আসিয়া, ইহকাল ও পরকালের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, শোকসন্তপ্তমনে অশ্রু মুছিয়াছি। নিকটেই আমার এক জন পরম আত্মীয়ের প্রিয়তমার সমাধিমন্দির, এই ক্ষুদ্র সমাধিপার্শ্বে বসিয়া কত দিন তাঁহার স্বভাবের পবিত্রতা, তাঁহার আশ্চর্য্য সরলতা, এবং রমণীহৃদয়ের মধুরতার কথা চিন্তা করিয়া, তাঁহার অভাবে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি ; বহুদূরবর্ত্তী এই বিদেশে, প্রবাসের গভীর অভাবের মধ্যে

কতদিন তাঁহার আদর ও যত্নে মাতার করুণা ও ভগিনীর স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাঁহার ক্ষুদ্র বালকবালিকাগুলি নিরাশ্রয়, তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর হৃদয় শোকাকুলিত; এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ভারের কথা ভাবিয়া আমার অসীম দুঃখও ভুলিয়া যাই। যে দিন 'নালাপাণি' দেখিতে যাই, তাহার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে আমার এক জন আত্মীয়াকে এই সমাধির নিকটেই দগ্ধ করিয়া গিয়াছি, চিতার অঙ্গার তখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে দেখিলাম, তাহাতেই তাঁহার ইহজীবনের স্মৃতি বিজড়িত ছিল, সংসারে আর কেহ নাই, যে, তাঁহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করে। একবার চিতার নিকটে নিঃশব্দে দাঁড়াইলাম, পরলোকগত আত্মার জন্য আর একবার, বুঝি শেষবার, ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিলাম। তাহার পর পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এই স্থান হইতেই পাহাড়ে উঠিতে হয়। পাহাড় খুব উচ্চ নহে; অল্প দূর উঠিয়াই সেই মুদিখানা দোকান, আর উদারপ্রকৃতি খৃষ্টান ইংরাজরাজের সমুন্নত মহিমা-ধ্বজা সেই শৌণ্ডিকালয়। সকল জিনিষ ক্রয়বিক্রয়েরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু "কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতিক্রমে খুচরা আফিং গাঁজা মদ প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছি" এই সাইনবোর্ড-যুক্ত ছোটো দোকানে খরিদদারের সময় অসময় নাই। নিতান্ত যখন দেখিবে খরিদদার নাই, তখনও অন্ততঃ দুই চারি জন উমেদার শিক্ষানবিশী করিতেছে। আজ রবিবার অপরাহ্ণ, গুরখা পল্টনের সিপাহীগণ আজ বিশ্রাম পাইয়াছে,

তাই আজ এ দোকান খুব সরগরম দেখা গেল। যখন আমরা সেই দোকানের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সেখানে খুব হাসি তামাসা চলিতেছিল। বলা বাহুল্য, সুরা-দেবীরও উপাসনা চলিতেছিল; পাশেই নালাপাণি—আমরা সেই নালাপাণির জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিতে লাগিলাম। হতভাগ্যেরা যখন হৃদয়ের শোণিত এবং প্রাণের বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থে গরল পান করিতেছিল, তখন আমরা ভগবানের করুণাধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছিলাম। এমন স্বচ্ছ সুস্বাদু জলধারা—বিধাতার করুণাধারা ভিন্ন তাহাকে আর কিছু বলিয়াই তৃপ্তি হয় না। স্থানের সৌন্দর্য্য, তাহার উপর এমন মধুর গম্ভীর সন্ধ্যাকাল, চতুর্দ্দিকে শ্যামল লতা-পল্লব, তাহার মধ্যে এই নির্ঝরিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস; সঙ্গী বন্ধুর প্রাণ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে সেখানে বসিয়াই একটি গান গাহিতে বলিলেন। কি গান গাহিব? এমন স্থানে আসিয়া আর কোন গান কি মনে আসে? প্রাণের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়। আমাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দ ব্যক্ত করিবার উপযোগী সঙ্গীত সহজেই মনে পড়িল। দুই বন্ধুতে সেই নির্ঝরের পাশে দীর্ঘবাহু শালবৃক্ষের মূলদেশে উপবেশন করিয়া মুক্তপ্রাণে গাহিতে লাগিলাম,—

"তাঁহারি আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,

সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা কয়ে।
সে পুণ্য নির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ;
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়;
সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে।"

গানের শেষে মনে হইল, এই নির্ঝরপার্শ্বে, শৈল-অন্তরালবর্ত্তী এই তরুচ্ছায়ায়, প্রকৃতির এই রমণীয় নিভৃত কুঞ্জে, প্রকৃতির কবি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে বসাইয়া যদি তাঁহার মুখে এই গানটি শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকের এই পবিত্র সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইত। এই সঙ্গীতশ্রবণে হয় ত তাহার যথার্থ উপভোগ হইত। এবং হৃদয়ের পিপাসাও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদা সকল সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, কিন্তু কর্ণে যদি মধুর ভাষায় সেই সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম ধ্বনিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সৌন্দর্য্যের যিনি কারণ, তাঁহার বিকাশ অনুভব করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হয়। যখনই যে সুন্দর স্থানে গিয়াছি, কবিবরের রচিত সেই সকল স্থানের রমণীয় দৃশ্যবৎ সুন্দর গান গাহিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা গলায় শূন্য-হৃদয়ে কি তেমন করিয়া

গাহিতে পারা যায় ?—পারি নাই, তাই সেই দূর প্রবাসে, নির্জ্জন অরণ্য, মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, উপলসঙ্কুল খরতোয়া পার্ব্বত্য প্রবাহিনী, প্রকৃতির প্রমোদ উদ্যান, সকল সুন্দর স্থানেই কবিবরের অভাব বড় গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছি। আমার পরম পূজনীয় পিতৃস্থানীয় আত্মীয় প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেরাদূনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন এক দিন এই সুরম্য স্থান দেখিয়া তিনি এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়াছিলেন,—"বড়ই ইচ্ছা করে, আমার যারা আপনার জন আছে সকলকে ডেকে এনে এই সুন্দর ছবিখানি দেখাই —এ স্থানটি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" দেরাদূনে অবস্থান-কালে তিনি অনেক সময়ই বলিতেন,—"কে যেন কোনও এক সুন্দর দেশ হ'তে এই রমণীয় সহরটা চুরী ক'রে এনে এই পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রেখে গেছে।"

ঝরণা দেখা শেষ হইলে, সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। জানিতে পারিলাম, তাহা আরও উপরে। বিলম্ব না করিয়া সেই আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদিগকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী অতি সমাদরে আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমপ্রাঙ্গণে আহ্বান করিলেন। দেখিলাম, তিনি তিন চারিটি বালককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন। বালক কয়টি শরীর দুলাইয়া তাড়াতাড়ি

ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতেছিল। আমাদের দেশে পূজার সময় পুরোহিত ঠাকুরেরা যেমন চণ্ডী পাঠ করে, তাহার এক বর্ণও বুঝিবার যো নাই, ইহাদের এ আবৃত্তিও তদ্রূপ। আমরা বাহিরে জুতা রাখিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। তিন চারিখানি সুন্দর পরিষ্কার ঘর, উঠানটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চারি দিকে অনেকগুলি গাছ; ফলভরে বৃক্ষগুলি অবনত, সতেজ পত্রে স্নিগ্ধতা ক্ষরিত হইতেছে। তপোবন-প্রাঙ্গণে একটি বিল্বতরু; একটি রুদ্রাক্ষের গাছ অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গিগণের যত্নে তপোবনের ন্যায় শোভান্বিত হইয়াছে; তাহার স্নিগ্ধ ভাব দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। সন্ন্যাসী যে কঠোরপ্রকৃতি দার্শ-নিক নহেন, সেই শুষ্ক যোগসাধনার মধ্যেও কবিহৃদয় বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার স্থাননির্ব্বাচনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্থানটি এমন সুন্দর যে, সেখানে দাঁড়াইলে সমস্ত দেরাদূন সহরটি বেশ পরিস্ফুটরূপে দেখা যায়, ঠিক যেন একখানি চিত্রের ন্যায় সুশোভন ও নয়নরঞ্জন। দিবাবসানে এই তপোবনের উন্মুক্ত প্রান্তে দাঁড়াইয়া একবার দেরাদূনের সৌম্য শান্ত শোভা নিরীক্ষণ করিলাম, আলো ও ছায়ার মধুর মিলনে গিরিউপত্যকা-বিরাজিত, হরিৎপত্রবৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকাপূর্ণ দেরাদূন সহর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে যেন বিশ্রাম করিতেছে, এবং সান্ধ্যতপনের লোহিত প্রভা তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে; মধ্যাহ্নের অস্ফুট কলরব যেন ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই শোভা দেখিয়া তপোবনের তরুচ্ছায়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ধনীর অট্টালিকায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা হস্তী অশ্ব গৃহসজ্জা প্রভৃতি দেখাইয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্বেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে; আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটও সেই মানব-রীতির ব্যবহারবিষয়ে ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না। তিনি আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার তপোবনের প্রত্যেক বৃক্ষ আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন, কোন্ বৃক্ষটি কোন্ বৎসর রোপিত হইয়াছিল, এমন কি, কোনটি কবে ফলবান হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবানের কৃপার কথা বলিতে লাগিলেন, অবশেষে বিগলিতহৃদয়ে বলিলেন, "আরে বাবা! দীনদয়াল কঠিন প্রস্তর্‌সে অমৃতধারা বাহার্ কর্ দিয়া।"—তাঁহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহা মরুময়, পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন! ভগবানের নামে সহজে তাহা গলিতে চাহে না।

সমস্ত দেখা শেষ হইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমরা একটি বাঁধান গাছের তলে আসিয়া বসিলাম। সন্ন্যাসীর কয়েক জন শিষ্যও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ পল্টনের ছুটি, কেহ মদের দোকানে বসিয়া সুরাদেবীর সেবা করিতেছে, কেহ বা সপ্তাহান্তে আজ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া এক সপ্তাহের জন্য প্রাণের ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে;

পুণ্যকথা শুনিতে শুনিতে এই সকল সিংহবিক্রম উদ্ধত সৈনিকপুরুষের হৃদয়ও মেষের ন্যায় শান্ত ভাব অবলম্বন করে।

সন্ন্যাসী অনেক শাস্ত্র-কথা বলিলেন; হরিশ্চন্দ্রের কথা, জন্মদুঃখিনী পুণ্যবতী জানকীর পবিত্র কাহিনী, নল দময়ন্তীর দুর্দ্দশার বিবরণ প্রভৃতি পৌরাণিক বৃত্তান্তও বিবৃত করিতে লাগিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে হয় ত তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, আমরা যখন লেখা-পড়া-জানা লোক, তখন আমাদের এ সকল কথা জানাই খুব সম্ভব, তাই গল্পের শেষে আমাদিগের দিকে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "ইহারা অধিক লেখা-পড়া জানে না, ইহাদিগকে এই সকল পুরাণকথা বলিলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ইহাদের অনেক জ্ঞান হয়, ইহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, এবং এই সকল কথা শুনিতে ইহাদিগের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক।"—যাহা হউক, এ সকল কথা সমাপ্ত হইলে তিনি আমাদের নিকট দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং "মায়াবাদ", "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ", "অবতারবাদ", "জন্মান্তরবাদ" প্রভৃতি বিষয় বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, লোকটি বেশ তার্কিক; ইহার আর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, ইনি শাস্ত্রকে দূরে রাখিয়া তর্ক করেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা প্রথমেই শাস্ত্র চাপিয়া ধরেন, এবং তর্কে পরাস্ত হইলে শাস্ত্রের উপর আপনার অপদস্থ পণ্ডিত্যাভিমান স্তূপাকার করিয়া মুক্তকচ্ছে যে সকল বাপান্ত ও অভিশাপান্ত প্রয়োগ করেন, তাহা শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া অতি অল্প লোকেরই ভ্রম হয়।

এই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট সেই সনাতন প্রথার ব্যভিচার দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত ও মূর্খ পণ্ডিতের পার্থক্য বুঝিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ইনি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহাই বিশ্বাস,—সন্ন্যাসী বলিলেন, তর্কক্ষেত্রে যাহা অভ্রান্ত, তাহাকে আনিয়া ফেলিলে স্বাধীন তর্কের পথ সহসাই রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভ্রম ও সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; যাহা প্রাণের বস্তু, বিশ্বাসের নির্ভর, তর্কের যুদ্ধে তাহাকে বর্ম্মরূপে ব্যবহার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে, কারণ যদি সেই বর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্ত্রের আঘাত লাগে, তবে তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাঁর মুখেই আমি প্রথমে শুনিলাম, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজা-য়তে॥" এই শ্লোকটি পরে বোধ হয়, পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর প্রাণে বিশেষরূপে বাজিয়াছিল। সে কালের পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে এরূপ স্বাধীন মতের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, তাই বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে সেকেলে পণ্ডিতদিগের আক্রোশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, সেই জন্যই বোধ হয় কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দুত্বের সীমা হইতে নির্ব্বাসন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকটিও প্রাচীন পণ্ডিতদিগের রচনা; ইহা হইতেই আমরা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উদারতা, যুক্তির প্রতি গভীর ভক্তি এবং কর্ত্তব্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের আধুনিক

চেলাদিগের ভণ্ডামী ও অশ্রদ্ধেয় বাক্যকৌশলের পরিচয় পাই। কিছু দিন পূর্ব্বে 'সাধনায়' উক্ত পত্রিকার জনৈক প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন শূন্যবাদ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, ইংরাজীতে একটি গল্প আছে যে, কিল্‌কেনির বিড়ালেরা এমন যুদ্ধ করিত যে, যুদ্ধাবসানে তাহাদের লেজগুলি ভিন্ন আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু প্রাচীন শূন্যবাদীদিগের তর্কযুদ্ধে লেজ দূরের কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই উড়িয়া যাইত। এ কথা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে যতখানি না খাটুক, আধুনিক পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে খাটে বটে! আমার এক জন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু অনেক সময়ই বলিয়া থাকেন, "উদরে কিঞ্চিৎ গব্যরস (অর্থাৎ ইংরাজী বিদ্যা) না পড়িলে স্বাধীন যুক্তির দ্বার মুক্ত হয় না।" আমার বর্ত্তমান সন্ন্যাসী ঠাকুর কিন্তু এক জন honourable exception। যাহা হউক, সন্ন্যাসী মহাশয়ের স্বাধীন মত কিরূপ, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশকালপাত্রভেদে আইনের যেমন নজীর গঠিত হয়, সেইরূপ এখন শাস্ত্রাদিসম্মত বিধিরও "রদ বদল" করা উচিত কি না? সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বিশেষ তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "আল্‌বৎ!" অবশেষে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া যেন একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আরে বাবা বহুৎ রদ্ বদল হো গেয়া; আভি হিন্দু লোগোঁনে হরওয়াক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য সমাজমে চালায় লেতেঁ হি।"—তাঁহার কথার ভাবে এই বুঝিলাম, রদ বদল চাই, তবে

এখন যেরূপ ভাবে তাহা হইতেছে, সেরূপ প্রার্থনীয় নহে।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসী আমাকে দুই তিনটা অপক্ক রুদ্রাক্ষ আনিয়া দিলেন, এবং বন্ধুকে একটি সুপক্ক বৃহৎ "পেঁপে" উপহার দান করিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সেই পুণ্য তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইলাম।

পথে আসিতে আসিতে সঙ্গী বন্ধুকে বলিলাম, দেরাদূনের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিবার, তাহা সমস্তই দেখা শেষ হইল, বোধ হয়, আর কিছু দেখিতে বাকি থাকিল না; বন্ধু আমার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত অল্প হাসিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের বাসস্থানের অতি নিকটেই এমন কিছু দর্শনযোগ্য বস্তু দেখাইতে পারেন, যাহা আমি সে প্রদেশে দেখিবার আশা করি নাই। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া সেরূপ কোনও বস্তুর আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারিলাম না, তখন তিনি সেই দিনই সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আর অধিক বেলা নাই দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। শীঘ্রই পূর্ব্বকথিত শ্মশানের-নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সম্মুখ দিকে আসিলেই আমরা বাসায় যাইতে পারি; কিন্তু সে দিকে না আসিয়া বন্ধুটি আমাকে দক্ষিণ পাশের একটি জঙ্গলময় পথে লইয়া চলিলেন। কিছু

দুর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা "রিচপানা" নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে একটু নীচে নদীর অপর পারে সহর দেখা যাইতেছে, যেন প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকারের শান্তিময় ক্রোড়ে দেরাদূন ঢাকিয়া যাইতেছে। নদীতীরে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র বনের আড়ালে অল্প-পরিসর একটু স্থান লৌহ রেলিংএ পরিবেষ্টিত; তাহার মধ্যে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র স্তম্ভ বিরাজিত। না জানি কোন্ মহাত্মার নশ্বর দেহের ধ্বংসাবশেষ এই রমণীয় নির্জ্জন প্রদেশে জীবনের অবসানে পরম শান্তি উপভোগ করিতেছে? কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষুদ্র লৌহকবাট ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম; তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্তম্ভের গাত্রের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, স্তম্ভদ্বয়ের গাত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সুস্পষ্ট ইংরজী অক্ষরে কি লেখা আছে। অন্ধকার হইয়াছিল, তথাপি বিশেষ যত্ন করিয়া লেখাগুলি পড়িয়া দেখিলাম; দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে লিখিত আছে;

To the Memory of

Major General Sir ROBERT ROLLO GILLISPIE
K. C. B.

Lieutenant O'HARA, 6th N. J.

Lieutenant GOSLING, LIGHT BATTALION

Ensign FOTHERGILL, 17th N. J.

Ensign ELLIS„ Pioneers.
Killed on the 31st October 1814,
Captain CAMPBELL, 6th N. j, Lieut. LUXFORD,
Horse Artillery,
Lieutenant HARRINGTON, H. M. 53 Regt.
Lieutenant CUNNINGHAM, 13th N. J.
Killed on the 27th November,
And of the non-commissioned officers and men
Who fell at the Assault.

কোন্ কোন্ সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল, এই স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে তাহাদিগের তালিকা আছে; তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

দ্বিতীয় স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে এইরূপ লিখিত আছে;—

This is inscribed
As a tribute of Respect for our adversary
BULBUDDER
Commander of the Fort
And his Brave Gurkhas
Who were afterwards
While in the Service of RANJIT SING
Shot down in their Ranks to the last man.
By Afgan Artillery.

পশ্চিম পার্শ্বে;—

On the highest point
Of the hill above this Tomb

Stood the Fort of Kalunga ;
After two assaults
On the 31st October and 27th November,
It was captured by the British troops
On the 30th November 1814,
And Completely razed to the Ground.

সমস্ত পাঠ করিয়া আমি অবাক্। এই শান্তিপূর্ণ বিজন প্রদেশে, এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে, আমার মানস নয়নে একটি শোচনীয় ঐতিহাসিক দৃশ্য উন্মুক্ত হইল ; শত শত বীরের হৃদয়শোণিতে কর্দ্দমিত কোলাহলপূর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে আমি দণ্ডায়মান! বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিয়াছিল, বজ্রানল বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল!—আজ সমস্ত নীরব, শুধু এই দুইটি স্তম্ভ এবং কয়েকটি অক্ষর নীরব ভাষায় আগন্তুক পথিকের নিকট সেই ধ্বংসকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে এই ঘটনা সম্বন্ধে এক বর্ণ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল না ; Talboys Wheeler সাহেব তাঁহার ইতিহাসে অনেক কথা লিখিয়াছেন,—এ যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনিও বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই ; শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বিদ্যালয়পাঠ্য ভারত-ইতিহাসে কলুঙ্গার নামমাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু এই কলুঙ্গার যুদ্ধক্ষেত্র পরাক্রান্ত গুর্খা সৈন্যের

অসাধারণ সাহস, অবিচলিত বীরত্ব এবং গভীর কর্ত্তব্যের বিকাশস্থল; হল্‌দীঘাট ও থর্ম্মাপলীর ন্যায় বীরত্বের ইহাও এক মহাতীর্থ, কিন্তু ইতিহাস এখানে মূক!, এই যুদ্ধের বিবরণ পরবর্ত্তী প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইল।

কলুঙ্গার যুদ্ধ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করিয়াছি যে, গত শতাব্দীর প্রথমে এখানে এক ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাস-প্রণেতৃগণ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চ সিংহাসনের প্রতি বর্ত্তমান লেখকের লোভ না থাকিলেও, এই প্রবন্ধে সেই যুদ্ধ ব্যাপারের একটি বিবরণ প্রকাশ করা, বোধ করি, বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কি কারণে ইংরেজদিগের সহিত গুর্‌খা জাতির বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা অনাবশ্যক; কারণ যাঁহাদের অবগতির জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তাঁহারা নেপালের ইতিহাস এবং নেপালযুদ্ধের বিবরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, সারণ, গোরক্ষপুর এবং বেরিলী জেলার উত্তর সীমান্ত প্রদেশে, এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী রক্ষণাধীন রাজ্যসমূহে, গুর্‌খাগণ প্রায় সর্ব্বদাই অত্যাচার করিত; এই সকল অত্যাচারনিবারণই গুর্‌খা যুদ্ধের উদ্দেশ্য,

ইহার মুখ্য কারণ; তবে গৌণ কারণও যে কিছু ছিল না, এমন নহে।

অনেকেই কলিকাতা সহরে নেপালী গুর্‌খা দেখিয়াছেন; ইংরাজদিগের কয়েকটি গুর্‌খা রেজিমেণ্টও আছে। ইহারা বলিষ্ঠ, খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ এবং অত্যন্ত কার্য্যকুশল; অসভ্য হইলেও ইহারা সত্য ও বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিতে জানে। এমন বিশ্বস্ত বন্ধু, অথবা প্রবল শত্রু অন্য জাতির মধ্যে কদাচ দেখা যায়। ইহারা তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে ভালবাসে, কিন্তু "খুক্‌রী" ইহাদের জাতীয় অস্ত্র; খুক্‌রীর গঠন ছোরার ন্যায়; দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও খুক্‌রীগুলি এমন তীক্ষ্নধার, এবং খুক্‌রিধারী এমন ক্ষিপ্রহস্ত যে, চক্ষুর নিমেষেই, এক আঘাতে তাহারা শত্রুশির দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে ধনুর্ব্বাণেরও প্রচলন ছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও গুরখা জাতির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইবার সময়ে, নেপালের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ছিল; সৈন্যগণ য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত হইতেছিল, এবং তাহাদের নায়কগণও "কর্ণেল", "মেজর", "ক্যাপ্‌টেন্" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

গুর্‌খা যুদ্ধের অব্যবহিত কারণ অনেক পাঠকের অজ্ঞাত থাকিতে পারে; অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে, হঠাৎ এক দল গুর্‌খা-সৈন্য ইংরাজদিগের ভুতোয়ালের থানা আক্রমণ করে। এই দলের অধিনায়কের নাম মানরাজ ফৌজদার। থানার ১৮

জন কনেষ্টবল হত এবং ছয় জন আহত হয়। থানার দারোগাকেও ফৌজদারের সম্মুখে নৃশংসরূপে নিহত করা হয়।

উদ্ধত এবং অশিক্ষিত গুর্‌খা সৈন্যগণের দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ড হওয়া নূতন কিম্বা আশ্চর্য্য নহে। কোষে তরবারি বদ্ধ রাখিয়া ধীরভাবে ডাল রুটির শ্রাদ্ধ করা আমাদের চক্ষে অতি আরামজনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি এরূপ নির্ব্বিরোধ-জীবন বহন করা অতি বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়া মনে করে; শুধু গুর্‌খা বলিয়া নহে, পঞ্জাব রাজ্যের পতনের ইহাই প্রধান কারণ। যতদিন একচক্ষু, রাজনীতি-কুশল পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি দুর্দ্দান্ত খাল্‌সা সৈন্যগণকে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহ তাহাদের উপ-যুক্ত নেতা ছিল না; এ দিকে অবিরাম শান্তি উপভোগে তাহাদের যুদ্ধ-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছিল—শতদ্রু পার হইয়া তাহারা ইংরেজের ধনধান্যপূর্ণ লোহিত সীমা আক্রমণ করিল। অবিলম্বে নেতৃহীন বিশাল খাল্‌সা বাহিনী বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল, পঞ্জাবের সৌধ-চূড়ায় বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হইল।

ইতিহাসে এক ব্যাপার অনেক বার পুনরাবৃত্ত হয়। অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড ভীষণ ও রোমাঞ্চকর বটে, মেকলে সাহেবও ক্লাইবের জীবনীতে তাহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষাও ভয়ানক ব্যাপার গুর্‌খাদিগের দ্বারা

সম্পন্ন হইয়াছে। নেপালরাজ পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা, স্বরূপরতন একবার কীর্ত্তিপুর নামক গ্রাম আক্রমণ করেন। গ্রামবাসিগণ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কিছু দিন আত্মরক্ষা করে; অবশেষে তাহারা স্বরূপরতনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কিন্তু স্বরূপরতনকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, তিনি তাহাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু স্বরূপরতন অবশেষে প্রতিজ্ঞাপালন করিলেন না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের প্রাণদণ্ডের বিধান হইল, এবং গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেরই নাসিকা ও জিহ্বা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই কর্ত্তিত জিহ্বা ও নাসিকা দ্বারা গ্রামের লোকসংখ্যা স্থির করা হইয়াছিল, এবং এই বীর-গৌরব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, গ্রামের পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তন করিয়া "নাসকাটাপুর" এই নাম প্রদত্ত হইল। ভুতোয়ালের থানাধ্বংসের কাহিনী বা দারোগার হত্যাকাণ্ড, এই প্রকার পৈশাচিক ব্যাপারের সহিত তুলনায় অতি সামান্য।

ভুতোয়ালের থানা বিধ্বস্ত হইলে, ইংরেজগণ ইহার প্রতিবিধানে সহসা অগ্রসর না হওয়ায়, ইহারা আর একটি থানা আক্রমণ করিয়া, আরও অনেকগুলি লোককে নিহত করিল। এ সময় ইংরাজগণ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে উৎসুক হইলেও, বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায়, তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এ সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়া, ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজ-

প্রতিনিধি লর্ড ময়রা, নেপালরাজকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তদুত্তরে নেপালরাজ বৃটিশ সিংহকে এমন উদ্ধত উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা করা হইল।

দানাপুর, বারাণসী, মিরট ও লুধিয়ানা হইতে চারি দল সৈন্য সজ্জিত হইল; মেজর জেনারল জিলেস্পাই মিরট হইতে সজ্জিত সৈন্য দলের অধিনায়ক হইলেন। প্রথমে এই দলে সর্ব্বসমেত ৩৫১৩ জন সৈন্য ও ১৮ টি কামান ছিল, কিন্তু অবশেষে এই দলের আরও বলবৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্থির হইল, জিলেস্পাই-এর সৈন্যশ্রেণী প্রথমে শিভালিক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক দেরাদূনে উপস্থিত হইবে, তাহার পর বিরোধিগণের বল অবস্থা অনুসারে, হয় শ্রীনগরে অমরসিংহের থানার বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইবে, নয় লুধিয়ানা হইতে জেনারেল অক্টরলোনী যে সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নাহানে অমরসিংহের পুত্র রণজয় সিংহকে আক্রমণ করিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি তদানীন্তন দিল্লীর রেসিডেণ্ট মেটকাফ সাহেবকে গড়োয়ালের নির্ব্বাসিত রাজা স্থদর্শন শার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে রেসিডেণ্টের সহকারী ফ্রেসার সাহেব হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া দেরাদূনে তৃতীয় সৈন্যদলে (মিরটের দলে) যোগ দিলেন। এই দল সাহারাণপুর হইতে বাহির হইয়া মোহন-পাশের ভিতর দিয়া দেরাদূনে আসিয়া

উপস্থিত হইল। সে সময়ে পথ এতই কদর্য্য ছিল যে, খিরির সহৃদয় জমিদারগণ বিশেষ সাহায্য না করিলে বৃটিশ সৈন্য-গণকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। দেশীয় রাজন্য-বর্গের সাহায্যে ইংরেজগণ এইরূপ অনেকবারই আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন; অনেক যুদ্ধে গবর্মেণ্ট জানিতে পারিয়া-ছেন, দেশীয় রাজগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সাহায্য করেন, এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারা সকল অসুবিধা সহ্য করেন, কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্মেণ্ট এজন্য অনেক দিন হইতেই দেশীয়দিগকে রাজভক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, ২৪শে অক্টোবর ইহারা দেরাদূনে উপস্থিত হইল। শীতকাল, প্রকৃতিদেবী তখন হিমালয়ের পাষাণ দেহে স্তরে স্তরে তুষাররাশি ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন; প্রচণ্ড শীতে এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে সৈন্যদলের বিশেষ কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু এই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা ভিন্ন তাহাদের উপায় ছিল না। এই সময়ে রাজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে—দেরাদূনের ঠিক উত্তর পূর্ব্বে সাড়ে তিন মাইলের মধ্যে নালাপাণির পাহাড়ের উপর অমরসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বলভদ্র সিংহ সামান্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না; এই দুর্গের প্রতি বৃটিশ সেনানায়কের দৃষ্টি পতিত হইল।

কিন্তু এই দুর্গ জয় করা সহজ নহে; দুর্গ যে অজেয় এবং দুর্ভেদ্য, তাহা নহে; কিন্তু এই দুর্গের নিকটবর্ত্তী হওয়া—বিশেষতঃ সেই শীতকালে,—ভয়ানক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পাহাড় এমন সোজা যে, তাহার গাত্র বহিয়া অতি কষ্টে পথ করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে পথে এককালে অধিক লোক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর দুর্গপ্রান্ত হইতে নিম্নের সমতলভূমি পর্য্যন্ত ভয়ানক জঙ্গল এবং কণ্টকের অরণ্য,—ইহারা দুর্গবাসীর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যখন দেখিয়াছি, সে সময় সেখানে দুর্গম অরণ্য ছিল না, এবং পর্ব্বতে উঠিবার পথ ভাল না হইলেও দুরারোহ ছিল না। কিন্তু এখানে দেখিবার আর কিছুই নাই। এমন কি, দুর্গের ভগ্নাবশেষও আর দেখিতে পাওয়া যায় না; সেগুলি কালক্রমে পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং নিবিড় জঙ্গলে তাহা সমাচ্ছন্ন; তাহা দেখিয়া কে বলিতে পারে, এক দিন এই শৈল-শিখরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল? যতই ক্ষুদ্র হউক, যে কয়টি স্বাধীনতা-প্রিয় মানব-প্রাণ এখানে আপনাদিগের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিন, জগতের বীরত্বের ইতিহাসে তাহাদের নাম সন্নিবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু সে কাহিনী এখন স্বপ্নপ্রায়,—গৌরবের সেই শ্মশান এখন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন! হায়, মানব-গৌরব! দুই দিনেই তাহা এইরূপে অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

এই স্থানে দুর্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দুর্গ বলিলে অনেকের মনে কলিকাতার কিম্বা দিল্লী ও আগ্রার দুর্ভেদ্য, সুকৌশলনির্ম্মিত, সমুন্নত দুর্গশ্রেণীর কথা উদিত হইবে। নালাপানি, বা ইতিহাসে যাহাকে কলুঙ্গা

বলে, সে স্থানে যে দুর্গ স্থাপিত ছিল, তাহাকে এ হিসাবে "দুর্গ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। দুর্গ বলিলে পাঠকের মানস-পটে যে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে—নালাপাণিতে তাহার কিছুই ছিল না। হিমালয়ের অগণ্য প্রস্তরখণ্ড চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষসমূহ যুগাতীত কাল হইতে অটলভাবে সমুন্নত মস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড এবং এই শালবৃক্ষশ্রেণী, এই উভয় উপাদানে এই দুর্গ নির্ম্মিত। শালবৃক্ষের বেষ্টনী—আর তাহার পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে বীর বলভদ্র সিংহ ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

২৪শে অক্টোবর জিলেস্পাইর সৈন্যদল দেরাদূনে পৌঁছে; তিনি সে সময় স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সৈন্য পরিচালনের ভার কর্ণেল মৌলি সাহেবের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। শীত ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল; এবং খাদ্যদ্রব্যও বিশেষ সহজপ্রাপ্য ছিল না—সুতরাং শীতে সৈন্যগণকে অবসন্ন না করিয়া, প্রথম উদ্যমেই তিনি যুদ্ধ ব্যাপার শেষ করিবেন, স্থির করিলেন;—বিশেষতঃ একটি অসভ্য, পার্ব্বত্য পল্লীর ভূস্বামীকে পরাস্ত করিবার জন্য এতখানি আয়োজন, সেই সৈনিক পুরুষের নিকট কিঞ্চিৎ বাহুল্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অতএব সেই রাত্রেই কর্ণেল সাহেব বলভদ্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, যদি পরদিন প্রত্যূষে বলভদ্র আত্ম-

সমর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল নাই ; তোপমুখে তাহার আরণ্যদুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কর্ণেল মৌলি পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতেই এই দুর্গ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, সামান্ত ভয় প্রদর্শনমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

কিন্তু সেই অসভ্য দুর্গস্বামী অটল ছিল ; স্বাধীনতার অমৃতময় রসে তাহার বীরজীবন পুষ্ট হইয়াছে, মৃত্যুভয়ে সে ভীত হইল না ; ইংরেজ-বীরের সদর্প ভ্রুভঙ্গি উপেক্ষা করিল। নিয়মিত সময়ে দূত প্রত্যাগমন করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, বলভদ্র সিং ঘোর অবজ্ঞাভরে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে, ইচ্ছা হইলে ইংরাজ সেনাপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, সে জন্ম সে ভীত বা পশ্চাৎপদ নহে। সেই সামান্ত দুর্গের সামান্ত অধিস্বামী বৃটিশ সিংহকে এমন কথা বলিবে, ইহা কাহারও মনে হয় নাই ; বিশেষতঃ দেরাদুনেই যে গুর্খারদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্তের যুদ্ধ বাধিতে পারে, জিলেস্পাইর এ কথা একবারও মনে হয় নাই ; সেই জন্ম তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

বলভদ্র সিংহের অবজ্ঞাপূর্ণ উত্তর পাইয়া কর্ণেল মৌলি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; জিলেস্পাইএর অপেক্ষা না করিয়া পরদিন প্রভাতেই তিনি সমস্ত পথ ঘাট স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন, এবং তাহার পর হস্তীপৃষ্ঠে কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন কামান রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, এবং "ফায়ার" করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন

দুই চারি বার কামান গর্জ্জন শুনিয়াই পার্ব্বত্য মূষিকগণ ইংরাজের অমোঘ শক্তি বুঝিতে পারিবে, এবং পার্ব্বত্য বিবরে প্রবেশ করিবে, প্রকৃত যুদ্ধ বিগ্রহের আবশ্যক হইবে না। পূর্ব্ব হইতেই কর্ণেল সাহেবের এ ধারণা ছিল; কিন্তু দুর্গবাসিগণ ভয়ের অতি সামান্য চিহ্নও প্রকাশ করিল না। গম্ভীর তোপধ্বনি নিস্তব্ধ গিরি-উপত্যকায় পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল, দুই একটি বৃক্ষপত্র কম্পিত হইল, তরুশাখাসীন পক্ষিকুল এই অনভ্যস্ত শব্দে ভীত হইয়া উচ্চতর প্রদেশের অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। একখানি প্রস্তরখণ্ডও স্বস্থানচ্যুত হইল না; কামাননিক্ষিপ্ত গোলা দুর্গপ্রান্তস্থ শালব্যূহের সামান্য অংশও ভেদ করিতে পারিল না। কর্ণেল সাহেব এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহরানপুরে জিলেস্পাই সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন; পর দিন ২৬শে অক্টোবর প্রাতঃকালে জিলেস্পাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

জিলেস্পাই সাহেব একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসিলেন। অনন্তর দুর্গ আক্রমণের বন্দোবস্ত হইল। এই বন্দোবস্তে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নালাপাণি দুর্গের সম্মুখে প্রায় পাঁচশত গজ দূরে একটা সমভূমির উপর কামানশ্রেণী সজ্জিত করা হইল, এবং সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত হইল; কর্ণেল কার্পেণ্টার, কাপ্তেন ফাষ্ট, মেজর কেলি এবং কাপ্তেন ক্যাম্বেল্—এই চারিজন সেনানায়কের অধীনে চতুর্দ্দিকে সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইল। এই চারি দলে সৈন্যসংখ্যা

আট শত; এতদ্ভিন্ন মেজর লড্‌লর অধীনে ৯৩৫ জন "রিজার্ভ" রহিল। স্থির হইল, এই চারি দিক হইতে একই সময়ে নালাপাশি আক্রমন করিবে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ কোন্ দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধি দ্বারা অন্যের বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে যাওয়া, বিশেষতঃ আয়ত্ত করিয়াছি, এই সিদ্ধান্তে "লঙ্কাভাগ" করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। উপস্থিত ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত অনুধাবন করিলে জিলেস্পাই সাহেব বুঝিতে পারিতেন, এই কয় দিনের যুদ্ধায়োজনের মধ্যেও বলভদ্র সিংহ যে নির্ভীক ও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাহার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, এবং দুর্গ আক্রমণ তিনি যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ সহজ নহে। পথ দুরারোহ, কণ্টকারণ্যে সমাকীর্ণ; তাহার উপর দুই এক স্থানে প্রস্তরশ্রেণী এরূপ সুকৌশলে সজ্জিত ছিল যে, তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, কিন্তু পদসঞ্চারমাত্রেই তাহা গড়াইতে গড়াইতে বহু নিম্নে পতিত হয়। সৈন্যদলের সুশিক্ষিত পদচালনা, অসীম সাহস ও বল, এবং অব্যর্থ অস্ত্রকৌশল কোনও ক্রমেই সে পতন হইতে তাহাদিগের রক্ষা করিতে পারে না। উদ্ধত বীর জিলেস্পাই হয় ত এত কথা বিবেচনার অবসর পান নাই; পাইলে সহসা চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়া মুহূর্ত্তে তাহা জয় করিবার আশা তাঁহার নিকট অসম্ভব

বোধ হইত; হয় ত এই ভ্রম না হইলে অকালে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত না।

এ দিকে বলভদ্র সিংহের দুর্গ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সিঁড়ি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না; চারি দিকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বত যেন তাহার পাষাণদেহ বিস্তৃত করিয়া এই কয়টি স্বাধীনতাপ্রিয় মানবকে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিতেছিল। এক দিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল বটে, কিন্তু সেই দিক সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ; গগনস্পর্শী বিরাট শৈলশৃঙ্গ সে দিকে সরলভাবে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান; মনুষ্যনির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্র তাহা বিদীর্ণ করিতে সক্ষম নহে; মনুষ্যের দুর্দ্দম স্পৃহা এবং দাম্ভিক বল দর্প তাহাতে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

জিলেস্পাই সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, এবং কামান ছুড়িতে আদেশ করিলেন। কামানে ক্রমাগত অগ্নি উদ্গীরণ হইতে লাগিল; জ্বলন্ত, অগ্নিময় গোলকসমূহ মুহুর্মুহু বলভদ্র সিংহের দুর্গপ্রান্তে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী এবং তাহার গাত্রস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের একখানিও স্থানচ্যুত কিম্বা ভিন্ন হইল না; দুই এক খানির কোনও কোনও অংশ ভাঙ্গিল মাত্র।

কামান ব্যর্থ দেখিয়া জিলেস্পাই সাহেব একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কেত তোপধ্বনি করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়,

চতুর্থ দল, হয় সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পায় নাই, নয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা সঙ্কেতধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা অগ্রসর হইল না। কেবল কর্ণেল কার্পেণ্টারের সৈন্যদল ও রিজার্ভ ফৌজ বেলা নয়টার সময় অগ্রসর হইল। এতক্ষণ ইংরাজসৈন্য যে স্থান হইতে গোলা বর্ষণ করিতেছিল, সে স্থান এত দুর্গম বা দুরারোহ ছিল না; কিন্তু এইবার তাহাদের অধিক-তর ভয়ানক পথে অগ্রসর হইতে হইল। জিলেস্পাই এবার কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন যে, এই কার্য্য তিনি পূর্ব্বে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা তত সহজ নহে; আজ যুদ্ধ জয় করিতে অনেক সাহসী বীরের প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। তাহাও উত্তম, বলভদ্রের পার্ব্বত্য অধিকার আজ হস্তগত করিতেই হইবে; তাহার দুর্গে বৃটীশকেতন উড়াইতে না পারিলে বৃটীশ নামের গৌরব বিনষ্ট হইবে;—সাহস ও উৎসাহের সহিত জিলেস্পাই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত সৈন্যগণ সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীর দর্পে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দুর্গ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না। যিনি তাহাদের অধিনায়ক,—ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না; সৈন্যগণও সেরূপে শিক্ষিত হইয়াছিল।

মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা নিশ্চল হইল বটে, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না। সেনাপতি নিষ্কাশিত অসি হস্তে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দলে দলে ইংরাজ সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল; কিন্তু হতাবশিষ্ট দল হটিল না, সমান বীরদর্পে দুর্গপ্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইল।

সিঁড়ি ভিন্ন দুর্গে উঠিবার উপায় নাই। সঙ্গের সিঁড়ি তখন পশ্চাতে। অল্পক্ষণ পরে লেপ্টেনাণ্ট এলিস্ সিঁড়ি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং সিঁড়ি বাহিয়া তিনিই সর্ব্বাগ্রে উপরে উঠিলেন। কিন্তু উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আর দুর্গের ভিতরে অগ্রসর হইতে হইল না; বিপক্ষের বন্দুকের গুলি তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার প্রাণহীন দেহ দুর্গমূলে পতিত হইল। যাহারা দুর্গ-প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহারা একটু হটিয়া আসিল।

কিন্তু জিলেস্পাই সাহেব "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন; লেফ্‌টেনাণ্ট এলিসের মৃতদেহ তখনও তাঁহার সম্মুখে; দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়শোণিত তখনও শীতল হয় নাই। সেই চিরনিদ্রিত বীরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একবারে প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর আহত সিংহের ন্যায় আবার অগ্রসর হইলেন। প্রতিহিংসার যে

অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গিরি-দুর্গকে দগ্ধ না করিয়া যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

জিলেস্পাই দুর্গের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গ হইতে অধিকতর বেগে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল; সাহসী সৈন্যগণের অগ্রসর হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে যদি কার্য্যোদ্ধার হইত, তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিত। কিন্তু প্রাণ দান করিয়াও সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে ইংরাজ সেনা ক্ষীণ হইতে লাগিল, হত ও আহত সৈনিকের স্তূপে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জয়লক্ষ্মী আজ ইংরাজের প্রতি অপ্রসন্ন।

কিন্তু জিলেস্পাই আজ দুর্জ্জয় পণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। ক্রমাগত সৈন্যধ্বংস হইতে দেখিয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না; আজ তিনি জয় অথবা মৃত্যু, এই উভয় কাম্যের অন্যতরের জন্য কৃতসংকল্প। তিনি পুনর্ব্বার তরবারি হস্তে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিলেন। সহসা একটি জ্বলন্ত গোলা আসিয়া তাঁহার বক্ষে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রিজার্ভ দলের অধিকাংশ সৈন্যই জীবন বিসর্জ্জন করিল। ইংরাজ সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া দেরাদূনে প্রত্যাগমন করিল। অসহিষ্ণু জিলেস্পাই তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল পাইলেন; বহুসংখ্যক নির্ভীক বীর অকারণে

তাহাদের হৃদয়শোণিতে এই পাষাণময় গিরিতল অভিষিক্ত করিল।

সে দিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হইল। কর্ণেল মৌলি "সিনিয়ার অফিসার", সুতরাং তিনিই সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার এই দুর্গজয়ে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। অতএব দলপুষ্টি না করিয়া আর এ কাজে হস্তক্ষেপ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। Battering train এবং আরও অধিকসংখ্যক সৈন্যের জন্য তিনি দেরা হইতে দিল্লীতে পত্র লিখিলেন, এবং তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল। এদিকে বলভদ্র সিংহ বুঝিয়াছিলেন, সিংহ প্রতিশোধকামনায় সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে; তিনিও দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতে ও রসদ সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

২৪ এ নভেম্বর দিল্লী হইতে Battering train আসিয়া উপস্থিত হইল। কালবিলম্ব না করিয়া তাহার পরদিনই ইংরাজ সৈন্য পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। দুর্গ হইতে ৬ শত হস্ত দূরে একটী সমতল স্থানে কামান স্থাপন করিয়া শত্রু-দুর্গের দিকে ক্রমাগত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ২৬ এ দেখা গেল যে, দুর্গের সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন দুর্গ আক্রমণের আদেশ প্রদত্ত হইল। এবারেও উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল; উভয়ই নির্ভীক এবং শিক্ষিত; এক-দলের চেষ্টা এই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকে বিধ্বস্ত ও তাহা-

দের গিরিদুর্গ সমভূমি করিতে হইবে; অপরের চেষ্টা, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। এই যুদ্ধে এই দিনও তিন চারি জন ইংরাজ সেনা-নায়ক কর্ণেল প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেক কষ্টে এবং বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য হত আহত হওয়ার পর, ইংরেজ সৈন্যের এক অংশ দুর্গতলে উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্গের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। গিরিগুহার দ্বারে সিংহ অবস্থান করিলে, সেই গুহায় প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, গুর্খাবীর-গণের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত এই ভগ্নস্থান দিয়া দুর্গপ্রবেশও ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সকল গুর্খাবীরের সহিত ইংরেজগণের অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। গুর্খা অসভ্য হউক, কিন্তু তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা অল্প নহে; ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়িতে লাগিল, প্রতিবারই দশ পনের জন ইংরেজ সৈন্য হত বা আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল এই ভয়ানক স্থানে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে। বৃথা প্রাণ-দানে অস্বীকার করিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। মুষ্টিমেয় পার্ব্বত্য গুর্খা একবার নয়—দুই দুই বার শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে বিমুখ করিল। ইংরেজের অব্যর্থ সন্ধান অসভ্য গুর্খার বল ও সাহসের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল। ভারতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই, এবং যাহা ঘটিয়াছে ইতিহাস-প্রণেতৃগণ তাহারও বড় উল্লেখ করেন নাই। মানুষ

চিত্রকর, তাই সিংহ মানবহস্তে পরাভূতরূপে চিত্রিত হয়, ইহা কোনও বিখ্যাত গ্রন্থের লেখকের উক্তি ;—কিন্তু চিরকালই কি এ নিয়ম থাকিবে? ইহাতে মনুষ্যের বল এবং কৌশল প্রমাণিত হউক, কিন্তু মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় কি না সন্দেহ।

যুদ্ধ-পিপাসা প্রশমিত হইল না; দুর্গজয়ের আশাও ইংরেজগণ ত্যাগ করিতে পারিলেননা। দুর্গ আক্রমণের জন্ত আবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ৫৩ সংখ্যক সৈন্যদল পূর্ব্বে দুইবার অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু এবার তাহারা ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল; তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে চাহে না, যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীকভাবে প্রাণত্যাগ করিতেও তাহারা প্রস্তুত; কিন্তু তাহারা বৃথা অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে।

তিন দিন পরে সমস্ত ইংরেজসৈন্ত একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। সমস্ত ইংরেজসৈন্তের প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অগ্নির ন্তায় গুর্খাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্ত, তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইল। ক্রমাগত গোলাবর্ষণে দুর্গের পাঁচ ছয়টি স্থান ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মুষ্টিমেয় দুর্গবাসীগণের দ্বারা দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বীর বলভদ্র দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যায় না; এখনি ইংরেজসৈন্ত ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্তায় তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে। যদি মরিতে হয়, তবে বীরের মত মরাই বিধেয়। ইংরেজ যোদ্ধাগণকে তাহাদের ভুজবীর্য্য

দেখাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, বীর বলভদ্র হতাবশিষ্ট সত্তর জন সহচর সমভিব্যাহারে, দুর্গ ত্যাগ করিল। সেই সত্তর জন বীর নিষ্কাসিত অসিহস্তে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া ইংরেজসৈন্যরেখার অভ্যন্তর দিয়া আপনাদের অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বলভদ্র সিংহের পার্ব্বত্য দুর্গে পানীয় জলের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত ছিল না। এক নালাপানি ভিন্ন নিকটে অন্য কোনও নির্ঝরও ছিল না; কিন্তু নালাপাণিতে ইংরেজসৈন্যের ছাউনি; সেখান হইতে জল আনিয়া তাহা পান করা অসম্ভব। উষ্ণ-প্রধান প্রদেশ হইলে হয় ত তাহারা একদিনও সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু হিমালয়ের ক্রোড়ে শৈত্যের মধ্যে পিপা-সার প্রাবল্য অধিক নহে। গুর্খা সৈন্যদল কয়েক দিন জল পান না করিয়াও অতিবাহিত করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধে তাহারা ক্রমেই ক্লান্ত হইতে লাগিল; পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল; আহারসামগ্রী ফুরাইয়া আসিল; এবং ইংরেজসৈন্যের অক্লান্ত আক্রমণে তাহাদের বল ক্ষীণতর হইতেছিল। ইহার উপর দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হইল, সুতরাং এখন দুর্গত্যাগ ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? তাই তাহারা জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে ইংরেজসৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল।

নালাপাণি তাহাদের লক্ষ্যস্থান হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য কোনক্রমেই তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিল না;

ইংরেজসৈন্যরেখা বিদীর্ণ করিলে, কতকগুলি ইংরেজসৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু সেই বীর গুর্খাগণ হিমাচলের প্রিয় সন্তান; তাহারা যে পথে যেরূপে অক্লেশে অথচ দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল, শিক্ষিত ইংরেজসৈন্য তাহাদিগের অনুসরণে কোনক্রমেই সফলকাম হইল না। তাহারা প্রাণ ভরিয়া নালাপাণির নির্ম্মল জল পান করিল। এই জল দুর্গমধ্যে পাইলে তাহাদিগকে এমন অবস্থায় কখন এখানে আসিতে হইত না। যে সকল সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রণজিৎ সিংহের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল।

বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য, বলভদ্র সিংহের পরিত্যক্ত কলুঙ্গা-দুর্গে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, দুর্গমধ্যে হত ও আহতের সংখ্যা পঞ্চাশ জনের অধিক হইবে না। এত সামান্যসংখ্যক সহচরের সহায়তায়, বলভদ্র সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্যকে এতদিন বিফলপ্রযত্ন করিয়াছিলেন, পানীয় জলের অভাব না হইলে দুর্গরক্ষায় তাহারা কৃতকার্য্য হইত না, কে বলিবে? দুর্গ-প্রাচীরের মধ্যে কোনও গৃহাদি ছিল না। উন্মুক্ত শূন্য আকাশ তাহাদের চন্দ্রাতপ এবং বিশাল শালবৃক্ষ তাহাদের পর্ণ-কুটীরের অভাব বিদূরিত করিয়াছিল। হিমমণ্ডিত, মুক্ত গিরির অন্তরালে বসিয়া একটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। স্বাধীনতার প্রিয় সন্তান-বর্গের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া, ইংরেজ সৈন্যগণ লোলুপ দৃষ্টিতে

ইহার দিকে চাহিয়াছিলেন। অন্যান্য দুর্গের ন্যায় ইহারও একটা মোহকর আকর্ষণ ছিল; কিন্তু দুর্গবাসীগণের দুর্গ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহিনীশক্তিও যেন বিদূরিত হইল। দুর্গে ধনসম্পত্তির নামমাত্র নাই। আহারদ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়া আছে, হত ও আহতগণে দুর্গ পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান কঠিন।

ইংরেজগণ কলুঙ্গাদুর্গ সমভূমি করিয়া ফেলিল, এবং একটি বীরজাতি যেখানে একদিন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল, সে কথাটা যেন পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিবার জন্যই প্রকৃতি লতাপল্লবে এই পাষাণময় গিরি-অন্তরাল আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কলুঙ্গাযুদ্ধ সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনও ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত না হইলেও, উদার ইংরেজ-লেখক এ বিষয়ে কৃপণতা করেন নাই। দেরাদূনের ইতিহাস-লেখক R. C. Williams B. A., C: S. এই যুদ্ধের উল্লেখ-কালে নির্ভীক বীর বলভদ্রের প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "Such was the conclusion of the defence of Kalunga a feat of arms worthy of the best of chivalry, conducted with a heroism almost sufficient to palliate the disgrace of our own reserves."

জিলেস্পাই সাহেবের মৃতদেহ মিরটে সমাহিত করা হইয়াছিল; সেখানে আজও সমাধিস্তম্ভ আছে। সুদৃঢ় মার-

বেল স্তম্ভ এখনও নিম্নলিখিত কথা কয়টি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতের স্তব্ধ প্রান্তে অক্ষুণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে :—

Vellore Cornellis Palinbang, Sir R. R. Gillespie, D. Joejocarta,—*31st October 1814,—Kalunga.*

আর, AS a tribute of respect for our gallant Adversary Bulbhudder."—দেরাদুনের জঙ্গলে রিচপানা নদীর তীরে নির্জ্জনপ্রদেশে সেই ক্ষুদ্র মনুমেণ্ট। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রদর্শিত প্রকাশ্য সম্মান, এবং যতই সামান্য হউক, বীর ইংরাজ জাতি বীরের সম্মান রক্ষা করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

এই যুদ্ধের সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি ; কারণ ইহা দ্বারা গুর্খা জাতির চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের মনে পরিস্ফুটরূপে উদিত হইতে পারে। যে গুণ প্রাচীন হিন্দু বীরগণের মধ্যে অসাধারণ ছিল না, ভারতের রাজস্থানের ইতিহাস এবং প্রতীচ্য ভূমণ্ডলে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে যে গুণ প্রায় প্রত্যেক বীরের জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এই অসভ্য গুর্খা জাতির মধ্যেও সেই গুণের অভাব ছিল না ;—তাহা বিশ্বস্ততা এবং স্বজাতিপ্রেম।

দ্বিতীয় বার আক্রমণের সময় হঠাৎ একজন গুরখা সৈনিকপুরুষ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ইংরাজসৈন্যের রেখা অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে বামহস্তে তাহার মুখ আবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের সংকেতে তাহার

প্রতি গুলিবর্ষণ নিষেধ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বিস্মিত ইংরাজসৈন্য সেই মুহূর্ত্তেই গোলাবর্ষণ বন্ধ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য কুতূহলীভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই গুরখাসৈন্য ইংরাজসৈন্যশ্রেণীতে উপস্থিত হইলে দেখা গেল, ইংরাজনিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহার নীচের দন্তপাটী ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং ওষ্ঠদ্বয়েরও অভাব হইয়াছে। মৃত্যুভয়ে তাহার কাতরতা ছিল না, কিন্তু অকর্ম্মণ্যভাবে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক কষ্টকর মনে করিয়া, সে চিকিৎসার জন্য ইংরেজ ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল। ইংরেজ সেনানায়ক তরবারির এক আঘাতে সেই দন্তহীন যন্ত্রণাটাকে ইহলোকের পরপ্রান্তে প্রেরণ না করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন চিকিৎসার পর সে আরোগ্যলাভ করিল। তখন তাহাকে ইংরাজসেনাদলে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল; কারণ ইংরেজ সেনাপতির বিশ্বাস হইয়াছিল, এত দিন সেবা শুশ্রূষায় তাহার বীরহৃদয় যে পরিমাণে অধিকার করা হইয়াছে, তাহাতে সেই বিশ্বাসী গুরখা সৈনিকপুরুষ ইংরাজের একজন অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বিনয়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, এবং পুনর্ব্বার ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদলে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যদিও সেই অসভ্য পরিস্ফুট ভাবে কোনও

কথা বলে নাই, তথাপি সে সংক্ষেপে এমন একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছিল যে, যতদিন জান বাঁচিবে, ততদিন সে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যই তাহার বন্দুক ও খুকরী ধরিবে, এবং স্বদেশের জন্য সম্মুখযুদ্ধে বীরের ন্যায় পতন ভিন্ন তাহার অন্য উচ্চাশা নাই; তাহার পুণ্যকথা শুনিয়া ঐ গানটা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল :—

তোমারই তরে মা সঁপিনু বীণা, তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারই তরে এ আঁখি বরষিবে, তোমারই তরে মা গাহিব গান।"

টপকেশ্বর।

বাঙ্গলাদেশ নয় যে লম্বা চওড়া ছুটি পাওয়া যাইবে। আমাদের পূজার ছুটি সবেমাত্র তিন দিন। সে তিন দিনে কোন দূরতর দেশে বেড়াইতে যাইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্য কোন একটা বড় রকমের অভিযানের পরিবর্ত্তে এই পর্ব্বতের চারিদিকে যাহা আছে তাহাই দেখিব, স্থির করিলাম। এখানে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা বেশী আর কোথায় কি থাকিতে পারে? পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর শস্য-শ্যামল প্রদেশ, চির কলনাদিনী নির্ঝরিণী, হরিৎলতা-পল্লবসমাচ্ছন্ন কুসুমকুঞ্জ এবং বিহঙ্গকুলের অবিরাম কলধ্বনি; সংসারের ক্ষুধিত কোলাহল সেখানে নাই; পাণ্ডিত্য, তর্ক, মীমাংসা প্রভৃতির পর্ব্বতপ্রমাণ ধূলিতে সেই নির্ম্মল প্রদেশ আচ্ছন্ন নয়; শুধু স্বভাবের শোভা, পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রকৃতির প্রেমের উৎস; শুধু শান্তি ও বিরাম, সুখ ও সন্তোষ। সেই জন্যই পাহাড়ে যাওয়াই স্থির হইল। মহাষ্টমীর দিন, দুই প্রহরের সময় বন্ধুবর শ—বাবুর সঙ্গে টপকেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু এবার চারিদিক যে প্রকার

নির্জ্জন নিস্তব্ধ দেখিলাম তাহা বচনাতীত। তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়; কথা বলিলে মনে হয় আমার ভিতর হইতে আমিটা বাহিরে আসিয়া যেন আমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, আর চারিদিক হইতে তাহার গম্ভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোন প্রকার কোলাহল না থাকিলে স্থানের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। টপকেশ্বর ত একেই মহা গম্ভীর স্থান, তাহার উপর সেদিন সেখানকার গুর্খাদের ঘরে ঘরে পূজা; তাহারা সেই পূজাতেই ব্যস্ত, কাজেই গোলমালের কোন অবসর ছিল না। এই পার্ব্বত্য গুর্খাজাতি এই সময় নিজ নিজ ঘরে পূজা করে, এবং ছাগ মহিষাদির বলি দেয়। উপাসনা বিষয়ে তাহাদিগকে অসভ্য বলিবার যো নাই। তাহারা ভগবানের মহাসিংহাসনের নীচেই গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠাভরে অবনত হয়, তাঁহার প্রতিনিধিত্বের জন্ম কোন মৃৎপুত্তলিকার অবতারণা আবশ্যক বলিয়া মনে করে না।

টপকেশ্বরে তিনটি পর্ব্বত গহ্বর আছে। তাহার মধ্যে একটিতে প্রবেশ করিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। চতুর্দ্দিকে শব্দমাত্র নাই, কেবল গহ্বরের সম্মুখ দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী অবিরাম কুল কুল শব্দে নাচিয়া নাচিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগতিতে নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছে; সে যেন একটি দ্রব স্ফটিকের প্রবাহ!- মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণচ্ছটা পাহাড়ের বড় বড় গাছের দুই একটি পাতার ভিতর দিয়া এই নির্ঝরের জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

নির্ঝরিণী যেন তাহাতেই তাহার চিররুদ্ধ প্রাণে এক অনন্ত আনন্দের,—এক স্বর্গীয় আলোকের বিকাশ অনুভব করিতেছে; আর স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণ সেবন করিবার জন্ম অধিকতর অধীর হইয়া আজন্মের পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতেছে। আমার বস্তুতই রবি কবির সেই কবিতাটী মনে উদয় হইল,

উন্মাদিনী কল্লোলিনী
ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী
শিলা হোতে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
ঘন ঘন অট্টহেসে
ফেণময় মুক্তকেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া।"

চারিদিকের শত শত অপরিচিত বৃক্ষশাখা হইতে কত সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে, আর পর্ব্বত গাত্রে স্নিগ্ধ-শ্যাম শৈবাল সবুজ মখমলের মত বিস্তৃত আছে; তাহার মধ্যে নানা রঙ্গের ফুল। আমার মনে হইল, আমি বুঝি মৃত্যুর রাজ্য, অশান্তির আলয় পরিত্যাগ করিয়া এক অমর শান্তিপূর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সৌন্দর্য্য-সাগরে প্রাণ ডুবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা অন্যান্য গহ্বরের সন্ধানে বাহির হইলাম। এখানে যে তিনটি গহ্বরের কথা বলিয়াছি তাহাদের মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারা যায় না, কিন্তু ভিতরে অনেকদূর যাওয়া যায়। সন্ন্যাসীরা সেই সমস্ত জনমানবশূন্য অন্ধকারময় গহ্বরে বসিয়া জপ তপ করিয়া থাকেন; মনঃসংযোগের

পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বোধ করি আর নাই। নির্ঝরের জল বেশি হইলে এই সকল গহ্বরে যাইবার সুবিধা থাকে না; কারণ যদিও জল তখন গহ্বরের মধ্যে যায় না কিন্তু সেই সকল গহ্বর হইতে বাহির হইয়া লোকালয়ে আসিতে হইলে নির্ঝরের জল ভাঙ্গিয়া টপকেশ্বর মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। সেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নির্ম্মিত রাস্তা ধরিয়া উপরে উঠিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বর্ষাকালে কেহই টপকেশ্বরে যাইতে পারিত না, কারণ হয়ত দেখা গেল নদীর তেজ বেশ কম, আপাততঃ কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তখনই হয়ত হঠাৎ পাহাড় হইতে হু হু করিয়া জল নামিয়া আসিল, আর হয়ত চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সেই প্রকার বেগে জল বহিতে লাগিল। তখন সে স্থান হইতে জীবন লইয়া ফিরিয়া আগমন যে ভয়ানক কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক কালিকৃষ্ণ বাবুর অনুগ্রহে সে অসুবিধা দূর হইয়াছে।

টপকেশ্বর একটী তীর্থস্থান; যাত্রীগণ এক খণ্ড প্রস্তরকে মহাদেব বলিয়া পূজা করে। এ স্থানের নিকটে মানুষের বাস নাই; ইতিপূর্ব্বে যে গুর্খাদের কথা বলিয়াছি তাহারা দূরে দূরে বাস করে। এখানে আসিয়া পড়িয়া থাকিলে আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না, গুর্খারা এ সম্বন্ধে ভারি তৎপর; অতিথিকে অনাহারে রাখিয়া আহার করিতে ইহারা কিছুতেই রাজী নয়। এমন সাহসী ও অতিথিপ্রিয় জাতি

বোধ হয় পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। ইংরেজদের দুই রেজিমেণ্ট গুরখা সৈন্য আছে। এই দুই দলে সৈন্যসংখ্যা দুই হাজারের কিছু বেশী। দুই দলই এখানে থাকে, এক দল Old Regiment, দ্বিতীয় দল অল্প দিন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম New Regiment (নয়া পল্টন) পার্ব্বত্য প্রদেশে ইংরেজরাজ যত যুদ্ধ করিয়াছেন সর্ব্বত্রই এই দুই দল তাঁহাদের সঙ্গে ছিল; মিসর যুদ্ধেও ইহারা ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে ছিল। সাহস, আতিথেয়তা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুণ থাকিলেও ইহারা অত্যন্ত গোঁয়ার এবং মাতাল। ইহাদের যুদ্ধের অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু জাতীয় অস্ত্র ছোট ছোট তরবারি বা খুকরী।

বেলা শেষ হইল দেখিয়া আমরা আবার সেই আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া শ্রান্তদেহে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিলাম। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভা কি সুন্দর! যাঁহারা এ শোভা দেখেন নাই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পাহাড়ের কোন উচ্চ অংশে উঠি, দেখি সূর্য্যের লোহিত চক্র পাহাড়ের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে, তাহার কণককিরণধারা পশ্চিম আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতগাত্রে, শ্যামল শৈবালদলে, পার্ব্বত্যপুষ্পের পাঁপড়ীতে ও বিহঙ্গের সুন্দর পক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া যাইতেছে; তাহাদের বিচিত্র কূজনে, তাহাদের মুক্তপক্ষ স্বাধীন জীবনে আন-

জোচ্ছ্বাস ও গভীর শান্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আবার যখন পর্ব্বতের কোন অধিত্যকাস্থ রাস্তায় আসিয়া পড়ি, তখন দেখি, সন্ধ্যা খুব গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ঝিঁঝিরা সংগীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর নির্ঝরের সেই অবিরাম কুলুকুলু ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাখীর গান তখন বন্ধ, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষগুলির সে জীবন্ত ভাবও যেন রুদ্ধ; শুধু অন্ধকার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঘনীভূত হইয়া বিভীষিকার বিস্তার করিতেছে, আর তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বহুদূরবর্ত্তী রহস্যময় তারকার স্নিগ্ধচ্ছটা প্রবেশ করিয়া কবিত্ব ফুটাইয়া তুলিতেছে।

গুচ্ছপাণি।

বিজয়াদশমীর দিন ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। দুইটি বন্ধু এবার সঙ্গী। কন্‌কনে শীত, কিন্তু আমাদের উৎসাহ-বহ্নি সে শীতকে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেয় নাই। বাসা হইতে প্রত্যূষে বাহির হইবার সময়ে সকলেই স্নানের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়াছিলাম। নয়া পল্টনের মধ্য দিয়া আমরা চারি মাইল পথ পদব্রজে গেলাম; শেষে হিমালয় পর্ব্বতের এক ক্ষুদ্র শৃঙ্গে উপস্থিত হওয়া গেল। সহসা একটা প্রকাণ্ড মুক্ত প্রদেশ আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্য তখন আকাশের অনেক দূর উঠিয়াছে, কিন্তু তখনও খুব কুয়াশা; কুয়াশায় দূরস্থ হরিৎ বৃক্ষরাজি ও অনুর্ব্বর ধূসর পর্ব্বতকায় এক হইয়া গিয়াছে; সব যেন ছায়ার মত। আমরা আর বেশী ক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না করিয়া পর্ব্বতের গা বহিয়া প্রায় পাঁচ শত ফিট নীচে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রখর নির্ঝরের কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই নির্ঝরের নাম 'গুচ্ছপাণি'। চারি পাঁচ হাত প্রশস্ত একটি জলধারা পর্ব্বতগহ্বর হইতে বাহির হইয়া রমণীর কেশগুচ্ছের ন্যায় গিরি অঙ্গে ছড়াইয়া

পড়িতেছে। অন্যান্য পর্ব্বতে চারি দিক হইতে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া হুহু করিয়া জল পড়ে, আর তাহাতেই ঝরণার জল বেশী রকম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; 'গুচ্ছপাণি' কিন্তু সেরূপ নহে। পর্ব্বতের গাত্র হইতে অতি সামান্য জলই পড়িতেছে, কিন্তু বহুদূরস্থ পর্ব্বতগহ্বর হইতে একটা বৃহৎ জলধারা আসিতেছে। এই নির্ঝরের স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর নহে; বেশ স্রোত আছে বটে, কিন্তু একখানা যষ্টির সাহায্যে, শরীরে কিঞ্চিৎ শক্তি থাকিলে, উজানে যাওয়া যায়; কোথাও গভীর জল নাই। যষ্টির সাহায্যে আমরা একবারে পর্ব্বতের গাত্রে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে দেখি, পর্ব্বতের মধ্য হইতে যে স্থান দিয়া জল আসিতেছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। আমরা সেই অন্ধকার পথে প্রবেশ করিলাম। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও তাহার অপেক্ষাও কম, কোথাও বা একটু বেশী;—কিন্তু স্রোত ক্রমেই বেশী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। লাঠীর সাহায্যে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম; আমাদের জুতা, জামা, গাত্রবস্ত্র, শুষ্কবস্ত্র, সমস্ত বোঁচকা বাঁধিয়া এক বন্ধু পৃষ্ঠদেশে লইলেন, অপর বন্ধুর হস্তে জলখাবার ও তৈলের শিশি। মস্তকের উপর সহস্র হস্ত উচ্চ পর্ব্বত; কোনও স্থানে মাথা নোয়াইয়া যাইতে হইতেছে, কোথাও বা সোজা হইয়া চলিতেছি। গহ্বরের মধ্যে যে খুব অন্ধকার, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই একটু আলো দেখা গেল। অতি সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলাম, মাথা ও পা দুইই ঠিক রাখিয়া

চলা দরকার; মাথা বেঠিক হইলে পাহাড়ে লাগিয়া তাহা চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, আর পা একটু পিছলাইয়া গেলে, স্রোতের টানে পাথরের উপর পড়িলে, শরীর চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। উপরে যে আলোকের কথা বলিয়াছি, তাহা ক্রমেই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। শেষকালে এমন একটি স্থানে পৌঁছান গেল, যেখানে মাথার উপর পর্ব্বতখণ্ড নাই; পর্ব্বত সেখানে কাটিয়া দুইভাগ হইয়া গিয়াছে; উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট; কাটলের বিস্তার মাথার নিকট বোধ হয় চারি পাঁচ হাতের অধিক হইবে না। তখন বেলা প্রায় দশটা, সুতরাং সূর্য্যকিরণ পশ্চিম দিকের পর্ব্বতের গাত্রে এক হাত আন্দাজ নামিয়াছিল, আর সেই জন্যই আমরা একটু বেশী আলোক পাইতেছিলাম। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, সেখানে ফাঁক অনেক বেশী, কারণ উপর হইতে একখানি প্রকাণ্ড পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার নীচে দিয়া জল আসিতেছে; উপরে মুক্ত সূর্য্যালোক। আমরা বহু কষ্টে সেই ভাঙ্গা পাথরখানির উপরে উঠিলাম। কি সুন্দর স্থান! দুই পার্শ্বে দুইটি পর্ব্বত সরলভাবে দণ্ডায়মান, মধ্যে এক প্রস্তরসিংহাসন, আর তাহার পদধৌত করিয়া নির্ম্মল জলস্রোত ঝরঝর শব্দে প্রবাহিত! আমরা সেই স্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া সেই ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডের অপর পার্শ্ব দিয়া, আবার উজানে চলিতে লাগিলাম; হস্তে সেই দীর্ঘ যষ্টি। বলা বাহুল্য, আমরা উত্তর মুখেই অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের পথ এখন ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতেছিল, দুই জন মানুষ পাশাপাশি যাইতে পারে না; এক

জন লোক দুই কনুই বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলে কনুই দুই দিকের পাহাড় স্পর্শ করে। এদিকে প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রকার পরিসর। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই যে, আমার শরীরের পরিধি আর একটু বেশী বিস্তৃতি লাভ করে নাই, নতুবা এ দৃশ্য আমার নিকট চিরদিনের জন্য অদৃশ্য থাকিয়া যাইত। আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখি, সম্মুখে একটা জলপ্রপাত। বিশ পঁয়ত্রিশ ফুট উচ্চ হইতে হু হু করিয়া জল পড়িতেছে। সে শব্দের বিরাম নাই; নিস্তব্ধ পর্ব্বতগহ্বরে সে শব্দ কত গম্ভীর, তাহা বচনাতীত। আমার মনে হইল যে, সংসারের দৈনন্দিন কাজ যেন বেশ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছিল, কোথায়ও কিছুমাত্র অনিয়ম ছিল না, হঠাৎ কোথা হইতে যেন প্রলয়ের ঝটিকা উত্থিত হইয়া জগতের সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিল, যত নিয়ম উল্টাইয়া দিল; তাহার পর গভীর বিক্রমের চিহ্ন ঘূর্ণামান ফেনপুঞ্জে ন্যস্ত করিয়া প্রবলবেগে কোথায় চলিয়া গেল। আমরা কতক ক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম। অগ্রসর হইবার আর কোন পথ আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে করিতে জলপ্রপাতের পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে একটি অপ্রশস্ত পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। অতি কষ্টে সেই পথ দিয়া আবার অপর পার্শ্বের জলে অবতরণ করিলাম। একটু যাইয়া আর একটি জলপ্রপাত দেখিলাম; পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সেটিও পার হইয়া গেলাম। কিন্তু তাহার পরে যেন অন্ধকার অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; আর এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্রোতের প্রতিকূলে লম্ফ ঝম্প করিয়া আমরা ক্লান্তও হইয়া পড়িয়া-

ছিলাম; নতুবা আমরা পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমরা কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রা-মের একটি সুন্দর স্থান জন্য মনোনীত করিলাম। সেই স্থানে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ শেষ করা গেল। বন্ধুবর গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি সম্মুখে একটি সুন্দর গহ্বর দেখিয়াছিলাম; এখন ধীরে ধীরে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া মনের আনন্দে হস্তপদ বিস্তৃত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, আর পৃথিবীর সহস্র কথা আমার সেই গহ্বরদ্বারে অবিশ্রান্ত উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটাইয়া বন্ধুদ্বয়ের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। শুষ্ক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পুনরায় আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করা গেল। তখন বেলা অধিক ছিল না। কাপড় জুতা সমস্ত বোচ্‌কা বাঁধিয়া একটি বন্ধু লাঠীর আগায় ঝুলাইয়া লইলেন। আমরা আবার জলে নামিলাম। সে দিনের সেই সুন্দর দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে। আমার মনে হইল, যেন দুর্গা ঠাকুরাণী কৈলাসে যাইতেছেন, আর নন্দী ভৃঙ্গী বোচ্‌কা লাঠী লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছেন। সে দিন বিজয়াদশমী, সেই জন্যই বোধ হয় এই সাদৃশ্যটা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এই শুভ মুহূর্ত্তে কি আনন্দ-উৎসব চলিতেছে! গৃহে গৃহে প্রতিমাবরণের ধুম লাগিয়া গিয়াছে; সমস্ত বৎসরের আনন্দ আজ শেষ হইল, এত হাসি তামাসা, আমোদ আহ্লাদ

উদ্যম উৎসাহ, বৎসরের মত অবসিত হইল ভাবিয়া সরলা বঙ্গললনা আজ অশ্রুপূর্ণলোচনা। মাকে বিদায় দিতে ভক্তের হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়, কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে আবার সম্বৎসরের পর অশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ভাবিয়া বঙ্গযুবকগণ ম্রিয়মাণ। একে একে শস্তশ্যামল বঙ্গের নদীতীরে জলকোলাহল ও সহস্র সহস্র কৃষ্ণতার চক্ষুর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির অবিরাম বর্ষণ মনে পড়িয়া গেল। কত দিন হইল; বিসর্জ্জনের সেই করুণ বাদ্যধ্বনি, সানাইয়ের সেই বিষণ্ন রাগিণী শুনিয়াছি; আজ তাহারই দূর প্রতিধ্বনি বিস্মৃত স্বপ্নের শেষ আভাষের মত কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

যাহা হউক, এখন আসল কথা বলি। বিশেষ সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে যষ্টির উপর ভর দিয়া প্রায় ৫টার সময়ে আমরা গুচ্ছপাণি হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়াও কিছু দূর স্রোতের সঙ্গে নিম্নাভিমুখে যাইয়া দেখি, আর এক দিক হইতে আর একটা ঝরণা আসিতেছে। আমাদের সেই ঝরণা উজাইয়া যাইবার সাধ হইল। সে দিকে মস্তকোপরি পর্ব্বত নাই, পথের পরিসরও বেশী, পঁচিশ ত্রিশ হাতের কম নহে। এক বন্ধু দুই ঝরণার সঙ্গমস্থলে উপবেশন করিলেন, তিনি আর আমাদের সঙ্গে জলে জলে বেড়াইতে সম্মত হইলেন না। আমরা দুই জনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; এ নির্ঝরটি বড়ই ভয়ানক; পরিসর বেশী বটে, কিন্তু জলরাশি বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া বহিয়া আসিতেছে, সুতরাং ভয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। একবার

হঠাৎ পা পিছলাইয়া গেলে দশ হাত যাইতে না যাইতেই মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা অসীম সাহসে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক দূর যাওয়া গেল, অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় উপরে উঠিয়া উপবেশন করিলাম। তখন সেই জলের মধ্য দিয়া পুনরায় ভাটীতে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। শেষে শুনিয়াছিলাম, অত্যন্ত বলবান পাহাড়ী ব্যতীত অন্য কোন লোক কখনও ঐ রাস্তায় নামিতে সাহস করে নাই। আমরা একে দুর্ব্বল বাঙ্গালী, তাহাতে এই প্রকার পরিশ্রান্ত, এদিকেও বেলা প্রায় শেষ, চতুর্দ্দিকে ভয়ানক জঙ্গল; আমাদের মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। উপায় চিন্তা করিতেছি, সহসা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখি, একটি পর্ব্বতীয় স্ত্রীলোক জঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। আমরা তাহাকে আমাদের বিপদের কথা অবগত করাইলাম, এবং প্রত্যাশান্বিতভাবে অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। আমার বন্ধুটি পুনরায় আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; রমণী কোন উত্তর না দিয়া বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি বলিল। আমরা নিরুপায় দেখিয়া হাত পা নাড়িয়া ইসারায় ইঙ্গিতে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহাসে আয়া?" "কিস্‌ত্তরে আয়া?" আমরা এক নিশ্বাসে সমস্ত বলিয়া

ফেলিলাম। তখন সে বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, "বাঃ!" অর্থাৎ এই বীরোচিত অভিযান যেন আমাদের এই ক্ষীণ বাঙ্গালী বীর্য্যের পক্ষে খুব অতিরিক্ত। বলা বাহুল্য, তাহার কথায় আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইল। সে আমাদিগকে বলিল, ভাটীতে যাওয়া আমাদের কর্ম্ম নহে; তবে সে পর্ব্বতের উপর দিয়া একটি অরণ্যপথ দেখাইয়া দিতে পারে, সেই পথ দিয়া চলিয়া গেলে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিব। আমরা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম; সে দুই হাতে জঙ্গল ঠেলিয়া অনায়াসে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। আমার সঙ্গীটি যদিও বাঙ্গালী, কিন্তু তিনি জন্মকাল হইতেই পাহাড়ে; কোন দিনই তিনি বাঙ্গালাদেশ দেখেন নাই, এমন কি, নৌকা নামক জলচর পদার্থ কোন দিন তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসে নাই। পাহাড় তাঁর আজন্মের পরিচিত স্থান, সুতরাং তিনিও বেশ জোরে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সবে হাতেখড়ি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই কঠোর পরিশ্রমে আমি বেচারী মৃতপ্রায়; তাহার পর সেই জঙ্গল দুই পাশ হইতে গায়ে লাগিতেছে, কণ্টকের আঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, দুই এক স্থল হইতে রক্তপাতও হইল। আমার দুরবস্থা-দর্শনে পথ-প্রদর্শিকা রমণী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। পথে চলিতে চলিতে আমার মনে ভারি একটা দার্শ-নিক তত্ত্বের উদয় হইয়াছিল; আমার মনে হইল, রমণীস্বভা-বের কমনীয়তা ও বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই প্রায় এক রকম; কোন

পুরুষ পথ-প্রদর্শকের হস্তে পড়িলে আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্ত আমাকে বেশ দুই চারিটা তিরস্কার সহ্য করিতে হইত, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি একবারও আমার উপর দোষারোপ করিল না, মায়ের মত যত্ন করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, এবং যে নির্ঝরের মুখে আমাদের বন্ধু অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। তাহার পর আমরা ধীরে সুস্থে সন্ধ্যার পর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

চন্দ্রভাগা-তীরে।

শৈশবের চাঞ্চল্য এ বয়সেও আমাকে ত্যাগ করে নাই; এখনও দু দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। হাতে কাজ কর্ম্ম থাকিলে কথাই নাই, কিন্তু কাজ কর্ম্ম না থাকিলে অকারণে ঘুরিয়া বেড়ান আমার স্বভাব; এ স্বভাবপরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। ছোট ভাইয়েরা এখন আমার অভিভাবক, সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহারা তাঁহাদের এই নাবালক জ্যেষ্ঠটিকে সুপথে আনিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অথবা নীতিপুস্তক, এই দুইয়ের কিসের অভাবে আমার স্বভাব সংশোধিত হইল না, তাহা আমি এবং তাঁহারা, কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

হাতে কোনও কাজ নাই, এরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই মনের মধ্যে নানা প্রকার গভীর চিন্তার উদয় হইয়া মনটিকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলে। সে ভাবনা কেবল ইহকালের প্রাচীর-সীমায় আবদ্ধ নহে, পরকাল পর্য্যন্ত তাহার গতি বিস্তৃত; সময়ে সময়ে তাহাকে দার্শনিক চিন্তার নামান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমার মত গরিবের

দার্শনিক চিন্তার দরকার কি ? তাই আমি ছুটিয়া বাহির হই। লোকে অবসর পাইলেই বিশ্রাম করে, কিম্বা বন্ধু বান্ধবগণের সহবাসসুখে বা নির্জ্জনে পুস্তকপাঠে সময় অতিবাহিত করে,—কিন্তু আমি বিশ্রাম পাইলেই ঘুরিতে আরম্ভ করি। এরূপ অবস্থায় দুই দিনের ছুটি যে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? কোথায় যাই, কিরূপে ছুটির দিন কাটাই, এই ভাবনাতেই অস্থির। জীবনের দিনগুলি কোনও রকমে অতিবাহিত হইলেই আমার নিকট পরম শান্তি।

এই প্রকার যখন অবস্থা, সেই সময়ে সোমবারে একদিন ছুটি পাওয়া গেল। রবি সোম দুই দিন বিশ্রাম,—অতএব এই দুই দিন কাটাইবার জন্য কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইল।

সৌভাগ্যক্রমে আমার এক সঙ্গী জুটিয়াছিলেন। ইনিও আমার মত স্কুলের মাষ্টার ; আমরা দুই জনে এক বাসাতেই থাকি, এবং ইনি আমার এক ঘরের সঙ্গী। জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও বঙ্গদেশ বা বঙ্গভাষার সঙ্গে ইঁহার অধিক সম্বন্ধ নাই ; ইঁহার পিতামহের সঙ্গে সে সম্বন্ধ ছিল বটে। তিন পুরুষ হইতেই ইঁহারা 'পশ্চিমে'। ইনি বেনারস কলেজের ছাত্র, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর। বেশ বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী, সকলেই বর্ত্তমান সত্বেও, ইঁহার মন নির্ব্বেদভাবাপন্ন, সংসারের প্রতি আসক্তিবর্জ্জিত। বাহিরের লক্ষণেও তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইত ; এবং মস্তকে দীর্ঘকেশ, মৎস্যমাংসত্যাগী, মিতাচারী এই ভদ্রলোকটিকে দেখিলে, যোগী ঋষির একটি

নাগরিক সংস্করণ বলিয়া অনুমান হইত। তাঁহার ধর্ম্মমতও কিস্তূতকিমাকার;—ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও হিন্দুসমাজের অদ্ভুত মিশ্রণের উপর তত্ত্ববিদ্যার (থিয়সফি) আধিপত্য থাকিলে যেরূপ ধর্ম্মমত হয়, আমার এই বন্ধুটির ধর্ম্মও তদ্রূপ। এই বন্ধু আমার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন; ইনি বেশ ধর্ম্মনিষ্ঠ, এবং ইহার সহিত কথাবার্ত্তায় বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়াই ইহাকে সঙ্গী করিলাম। কিন্তু গৃহজীবী এমন একটি অল্পবয়স্ক যুবককে সঙ্গে লইয়া বন জঙ্গলে বেড়ান আমি তত নিরাপদ মনে করি না; বিশেষতঃ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার যেরূপ ঝোঁক, তাহাতে তাঁহাকে লইয়া দুই চারি বার ঘুরিলেই হয় ত তিনি গৃহের বন্ধন ছিঁড়িতে পারেন। যাহা হউক, আমি অবসর পাইলেই একা ঘুরি, হ—বাবু (এই বন্ধুটির নাম) এ জন্য দুঃখিত এবং আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উম্মাযুক্ত। তাঁহার অনুযোগ, আমি কেন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরি না;— আমি যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রেমাস্পদ ভ্রাতাভগিনী এবং কিশোরী প্রণয়িনীর কথা ভাবিয়াই তাঁহার এই উমেদারীর প্রতি এত উদাসীন সে কথা তিনি বুঝিতে পারেন না।

এবার এই রবি ও সোম দুই দিনের ছুটিতে একাকী কোথাও যাইতে ইচ্ছা ছিল না; সঙ্গিহীনের প্রাণের মধ্যে একটি সঙ্গীর কামনা জাগিয়া উঠিল। এই অরণ্য ও পর্ব্বতে ভ্রমণোপযোগী সঙ্গী কোথায়? প্রকৃতির সুন্দর শোভন দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেকে সঙ্গী হইতে চাহেন, কেহ বা পুরাতত্ত্ব,

কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের আশায় দুর্গম গিরিপথে, কি শঙ্কট-ময় বহু প্রাচীন পার্ব্বত্য অট্টালিকায় গমন করিতে পারেন; কিন্তু কেবল উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইবার আশায় বোধ করি কেহই আমার সাহচর্য্য অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। অন্য কেহ সম্মত না হইলেও, এ বিষয়ে হু—বাবুর কিছুমাত্র আপত্তি দেখিলাম না; সুতরাং আমার সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিলাম। তিনি তখনই প্রস্তুত; আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরিবেন, তাঁহার আর এ উৎসাহ রাখিবার স্থান হইল না। তিনি এক্কা কি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইতেছেন দেখিয়া আমার বড় হাসি আসিল; আমাকে হাসিতে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হই-লেন। আমি বলিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে, না জানিয়াই যানের বন্দোবস্ত?"—তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে গাড়ী ঘোড়া যাইতে পারে, উত্তম হাট বাজার আছে, এবং সঙ্গে দুই এক জন চাকর বাকরও চলিবে; কিন্তু আমি বুঝাইয়া দিলাম, আমার সঙ্গে চলিতে হইলে যান বাহনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আমি পদব্রজে যাইব, লোকজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বন্ধুটি রাস্তার দূরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন; তাহার পর তিনি প্রবল তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন, আমার এই প্রকার কঠোরতাস্বীকার নিরর্থক; আমি যখন সাধু সন্ন্যাসী নই, তখন যতটুকু বিলাসভোগ দূষণীয় নয়, তত-টুকুর প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত। আমি যে বিলাস ও

প্রয়োজন, এ উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেছি, ইহা বন্ধুবর অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, বিলাস-সুলভ ও প্রয়োজনীয়, এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে যে অন্তরাল আছে, তাহা অতি সামান্য; সেই জন্য অল্প কারণেই গোলযোগ ঘটে। আজ যে জিনিস বিলাসোপকরণ বলিয়া মনে হয়, দুই দিন পরে তাহাই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; তখন তাহা না হইলে আর চলে না। তর্কে সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমি কত দূর যাইব? তত দূর হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব কি না, আজ রাত্রে ফিরিয়া আসা কি সহজ হইবে? সেখানে থাকিবার স্থান আছে কি না, এবং সেখানে খাদ্যদ্রব্য পাইবার কতটুকু সম্ভাবনা? এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া তিনি আমাকে বিব্রত করিয়া ফেলিলেন। আমিও তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের নিরাশাব্যঞ্জক এক একটি উত্তর দিতে লাগিলাম। বলিলাম, রাস্তা কত দূর, তাহা জানি না, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ চলিতে হইবে; হাট বাজার নাই; থাকিবার স্থান আছে কি না, জানি না, না থাকারই অধিক সম্ভাবনা; সেখানে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যও পাওয়া যায় না; পথ হইতে দুই এক পয়সার বুটভাজা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভায়া অবিলম্বে বুঝিলেন, এ এক নূতন রকমের তীর্থ-পর্য্যটন। অতএব, এ সমস্ত অসুবিধা সত্বেও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, যেখানেই যাই, তাঁহার ন্যায় বন্ধুকে কখনই অনাহারে বাঘ ভালুকের মুখে সমর্পণ করিব না। আমাদের ভ্রমণের লক্ষ্য কি, তাহা জানিবার জন্য তিনি

বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্ত বলিলাম, "চন্দ্রভাগা-তীরে।"

নাম শুনিয়াই তিনি হাসিয়া আকুল; বলিলেন,—"এত-খানি বাক্যকৌশলের কিছু আবশুক ছিল না, সরল ভাবে পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া হইবে বলিলেই সকল কথা বুঝা যাইত।" তাহার পর তিনি প্রমাণ করিতে বসিলেন, এই দুই দিনের ছুটিতে কিছুতেই পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া যায় না; পদব্রজে ত দূরের কথা; তবে খুব কষ্ট স্বীকার করিলে অম্বালা কি অমৃত-সর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া নিয়মিত সময়ে চাকরীতে হাজির হওয়া যায়। আমি এক কথায় সমস্ত সারিয়া দিলাম। বলিলাম, "তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি যোগবলে তোমায় লইয়া যাইব।"—ভায়া Theosophist মানুষ, আমার যোগবলের কথা বিশ্বাস করিলেন কি না জানি না, কিন্তু নিরস্ত হইলেন।

শনিবারের দিন আমাদের আয়োজন শেষ হইল। আয়ো-জনের মধ্যে মোটা একখানি গাত্রবস্ত্র, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, এবং নগদ চারি আনার পয়সা। ভায়ার চক্ষুঃস্থির! এ কি রকম আয়োজন; এতেই চন্দ্রভাগা-দর্শন ঘটিবে? কোনও প্রকারে শনিবারের রাত্রি কাটিয়া গেল।

রবিবার অতি প্রত্যূষে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হই-লাম। দেরাদুন হইতে সাহারণপুর আসিতে হইলে একটি পথ পাওয়া যায়; এই পথটি দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া ঠিক দক্ষিণ মুখে আসিয়াছে, এবং শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া সাহারণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই জনহীন, পর্ব্বতা-

কীর্ণ, সৌন্দর্য্যবহুল, উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশ দিয়া আমরা দুইটি প্রাণী নিঃশব্দে অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়া আসিল, বিহঙ্গের সুমিষ্ট প্রভাতকাকলী স্তব্ধ বনস্থলী আচ্ছন্ন করিয়া নবীন সূর্য্যের আহ্বানগীতিরূপে যেন ঊর্দ্ধ গগনমণ্ডলে প্রেরিত হইল। চতুর্দ্দিকে অযত্নসম্ভূত তৃণলতায় সুরভি পুষ্প মুক্তাফলের ন্যায় শিশিরভারে আনত। নবোদিত সূর্য্যের লোহিত কান্তি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া ধূসর পর্ব্বতঅঙ্গে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, কেহ লোহিত-চূর্ণে পর্ব্বত-অঙ্গ রঞ্জিত করিয়াছে। আমরা কোনও লতা-মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, কোনও উচ্চ-বৃক্ষ-তল দিয়া আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম; এ যেন আমাদের শৈশবের জীবনপথে অগ্রসর হওয়া,—তেমনি উদ্বেগহীন, আনন্দপূর্ণ। যত দূর দৃষ্টি পড়ে, সমস্ত প্রদেশের উপর এক অটল বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় অনুরাগ প্রকাশিত; সমস্ত পথই অজ্ঞাত, কিন্তু আশঙ্কাশূন্য, যেন আপনার মাতার ন্যায় প্রকৃতি জননী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাদিগকে ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন।

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ পথ দিয়া প্রীতি-উচ্ছ্বসিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে দেরাদূন হইতে দুই তিন মাইল দূরস্থ পর্ব্বত-অধিত্যকায় একটি নদী দেখিতে পাইলাম; এই নদীর নাম "বিন্ধ্যাল"। সমস্ত গিরিনদী যে প্রকৃতির, "বিন্ধ্যাল"ও সেই প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন। এ সকল নদীতে জল থাকে না, কিন্তু পর্ব্বতে যখন প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখন এই সকল নদী দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রবলবেগে জলপ্রবাহ প্রবাহিত হয়।

তখন কাহার সাধ্য সেই প্রবল স্রোত রোধ করে, কিম্বা সেই সময় নদী পার হইয়া যায়? কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আর কিছু নাই, সম্পূর্ণ শুষ্ক, জলবিন্দুশূন্য। এই কারণে এ সকল নদীর উপর সেতুনির্ম্মাণের কোনও প্রয়োজন হয় না।

আমরা যখন নদী পার হইলাম, তখন তাহা শুষ্ক, সুতরাং পারের জন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। এই তিন মাইল চলিয়াই আমার বন্ধুটি কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারজি, এমনি পদব্রজে কি সাহারণপুরে যেতে হ'বে?" আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাতমাত্র না করিয়া সোৎসাহে এবং সবেগে চলিতে লাগিলাম। নিরুপায়ভাবে তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক একবার তিনি কাতরতা প্রকাশ করিয়া কোনও কথা বলিবার উপক্রম করিলেই, একটি সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, আর তিনি সমস্ত ভুলিয়া যান, মহা আহ্লাদে এবং আশ্চর্য্য ভাবে, মুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, ও উপসংহারে বলেন, "এমন সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে জীবনের পূর্ণ উপভোগ হইতে পারে। এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জ্ঞানানুভূতি অপেক্ষা কত মহত্তর; এই সৌন্দর্য্যানুভূতি তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা সেই পরমসুন্দর পুরুষকে বা মহিমান্বিতা অনন্ত প্রকৃতির অখণ্ড মাধুরীকে ধারণা করিতে পারে। আমরা বৃথা জ্ঞানের উপাধনে রত রহিয়াছি, ইহাতে না আছে তৃপ্তি, না আছে শান্তি; ইহাতে কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে,

এবং সন্দেহের ভিতর হইতে আমরা গভীরতর সন্দেহে ডুবিয়া যাই।"—আমি বলিলাম, "জগতের অভিব্যক্তিই সৌন্দর্য্য-মূলক ; এমন কি, জ্ঞানের মধ্যেও যদি সৌন্দর্য্যের বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের এত আদর থাকিত না। জ্ঞান অপেক্ষা বিধাতার সৌন্দর্য্যেই অধিক প্রীতি, এবং এই কথা যুনানীর অন্ধকবি মিল্টন অতি সুন্দর বুঝিয়াছিলেন, তাই আদমকে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিরসৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন ত্রিদিবের প্রমোদকানন পরিত্যাগ করিতে হইল।"—এইরূপ গল্পে ভুলাইয়া ভুলাইয়া তাঁহাকে লইয়া চলিলাম। অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, "আর ত চলিতে পারি না ; সকলই সুন্দর, কিন্তু এই গদ্য অংশ পথচলাটুকু যদি না থাকিত !"

একটু বিশ্রামের পর, আর অধিক চলিতে হইবে না, এই আশ্বাস দিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। অল্প দূরে—রাস্তার ধারে একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রাম দেখিয়া বন্ধুটির দেহে প্রাণ আসিল ; তাড়াতাড়ি আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বেলা বোধ হয় তখন নয়টা বাজিয়াছে। গ্রামের নামটি আমার মনে নাই। পশ্চিমের গ্রামগুলির নাম—তাহাদের পার্ব্বত্যপ্রকৃতির অনুরূপ, অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর ; শত শত গ্রাম ঘুরিয়াছি, সকলগুলির নাম শ্রুতিধর ভিন্ন অন্য কাহারও মনে রাখা সম্ভব নহে। গ্রামে দুই তিনখানি ছোট দোকান, তাহাতে প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

দেখিলাম, অদূরে লাল রঙকরা পাথরের অতি সুন্দর একটি অট্টালিকা, কিন্তু এই অট্টালিকা ও তাহার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অট্টালিকাটি কেমন সুন্দর, ছবির মত সুশোভন, তাহার ভিতরে কেহ যদি প্রস্ফুটিত পুষ্প-রাজি থরে থরে সজ্জিত রাখিত, তাহা হইলেই তাহার সদ্ব্যবহার হইত; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপরিষ্কারের জীবন্ত মূর্ত্তি কয়েকটি মানব গা দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া সমস্বরে উর্দ্দূ পড়িতেছে। তাহাদের সেই সমবেত স্বর আমাদের কাণে নিতান্ত মন্দ লাগে নাই; দেখিলাম, এই গোষ্ঠের নেতা প্রকাণ্ড এক সাদা পাগ্‌ড়ীধারী, বেত্রহস্ত, বিশ বাইশ বৎসর বয়স্ক এক শ্মশ্রুবিরল গুরুমহাশয়। তিনি ত্বরিতপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, গুরুমহাশয়টি আমারই এক প্রকার ছাত্র। তাঁহার অনুরোধে আমরা বিদ্যালয়গৃহে প্রবেশ করিলাম। ছাত্রেরা মাটীতে কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া আছে। হঠাৎ প্রভাতকালে অপরিচিত দুইটি অতিথিকে দেখিয়া সেই বালকবৃন্দের হৃদয়ে যে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, তাহাদের চঞ্চলচক্ষুর কোমল স্পন্দনেই আমি তাহা অতি সহজে অনুমান করিতে পারিলাম। বিশেষ যখন তাহাদের গুরুমহাশয় অতি ব্যগ্রভাবে আমাদের বসিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং চেয়ারখানিতে স্থানসংকুলান হইবে না দেখিয়া, অদূরস্থিত একটি কেরোসিনের বাক্স বহিয়া আমাদের নিকট রাখিলেন, তখন ছাত্রেরা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল; ভাবিল, তাহাদের যমের যম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গুরুমহাশয় সবিনয়ে তাঁহার ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ছাত্রেরা যে যে ভাষা শিক্ষা করিতেছে, সে সকল ভাষায় আমার অসীম দখল! বাস্তবিক, উর্দ্দু ও ফারশীতে আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে এই দুই ভাষায় অন্যের বিদ্যা পরীক্ষা চলে না; কিন্তু আজ কাল ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করে না; প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমরা, বিশেষতঃ এই গুরুমহাশয়শ্রেণী, বিশেষ ঋণী; কারণ, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ন বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার প্রসাদাৎ। কিন্তু সত্য বলিতে কি, যদি ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করিত, তবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের প্রশ্নপত্রের ভাষার চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতাম; এবং স্থূলোদর সিভিলিয়ান-পুঙ্গবেরা বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষাদানকালে The remarkable ladyর বঙ্গানুবাদে "ঐ মন্তব্য্যা স্ত্রীলোক" লিখিয়া অপূর্ব্ব ভাষাভিজ্ঞতা এবং অভিনব উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন না।

যাহা হউক, দুই চারিটি কথায় পরীক্ষা-শেষ করিয়া, গুরুমহাশয়কে চন্দ্রভাগার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; জানিতে পারিলাম, এই গ্রাম অতিক্রম করিয়া দক্ষিণের দিকে একটি জঙ্গল আছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। অধিক বিলম্ব না করিয়া, একটি দোকান হইতে কড়াইভাজা ও গুড় কিনিয়া দুই জনে অগ্রসর হইলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা শিভালিকের একেবারে কোলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। রাস্তার ধারে এক জন কৃষক জমি চষিতেছিল, তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দক্ষিণের একটি রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা তাহার নির্দ্দেশ মত চলিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কোনও পথই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল অরণ্যের মধ্যে রেখাবৎ একটি চিহ্ন; তাহাই অবলম্বন করিয়া লতা পাতা দুই হাতে সরাইতে সরাইতে চলিতে লাগিলাম। কোথাও পথ বেশ পরিষ্কার, আবার কোথাও গভীর জঙ্গল। স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্ধকার—সূর্য্য-কিরণের চিহ্নমাত্র দেখা অসম্ভব। খানিক দূরেই আবার সমস্ত পরিষ্কার, বেশ রৌদ্র, এবং চারি দিক খোলা। প্রকৃতির এই প্রকার বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়া প্রায় দুই মাইল ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রভাগা-তীরে উপস্থিত হইলাম।

এই চন্দ্রভাগা একটি সংকীর্ণকায়া ক্ষুদ্র গিরিনদী। সিন্ধুর অন্যতম শাখার নামও চন্দ্রভাগা, কিন্তু তাহার সহিত এই ক্ষুদ্র নগনদীর কোনও সম্বন্ধ নাই। সে চন্দ্রভাগা মহা-প্রতাপশালী, দুর্দ্দমনীয় সিন্ধুনদের একটি প্রধান শাখা; সে নিজেই বিখ্যাত, এবং তাহার চঞ্চল গতি পঞ্চনদের বিস্তৃত বক্ষঃ সুশোভিত করিতেছে; আর আমাদের পুরোবর্ত্তিনী এই চন্দ্রভাগা অরণ্যসঙ্কুল শিভালিকের কোনও এক অজ্ঞাত অংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে জন্মলাভ করিয়া, কত নির্ঝর ও জলপ্রপাতের দ্বারে দ্বারে সামান্য জল ভিক্ষা করিয়া

মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতেছে; আমাদের দেশের ছোট খালেও ইহা অপেক্ষা অধিক জল থাকে।

নির্জ্জন নদীতীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির। মন্দিরে মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান; মন্দিরের প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এবং এই মধ্যাহ্নকালেও তাহার মধ্যভাগ হইতে অন্ধকার বিদূরিত হয় নাই। কতকাল হইতে এই মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত! হয় ত চতুর্দ্দিকে কত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই ন্যায় মহাসমাধিনিমগ্ন, যেন বিশ্বের প্রলয়ের সহিত বিশ্বেশ্বরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

এই মন্দিরের সম্মুখে অতি জীর্ণ আর একটি সামান্য মন্দির দেখা গেল। প্রবাদ, ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে বহুদিন যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। এ কথা কত দূর প্রমাণিক, তাহা স্থির করা কঠিন; তাহার পর কতকাল অতীত হইয়াছে, বোধ হয়, কোনও লিখিত বিবরণও নাই। সুতরাং, এই মন্দির বুদ্ধদেবের তপশ্চর্য্যা সম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য না দিলে ইহার সত্যাসত্যের নির্ণয় হয় না; কিন্তু এমন সুন্দর স্থানে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছেন বলিলে অসম্ভব বোধ হয় না। এই সকল স্থানে আসিলে বুঝিতে পারি, যোগী ঋষিগণ ভগবানের চিন্তায় দেহপাত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ স্থান কেন মনোনীত করিতেন। আরণ্যপ্রকৃতির স্নিগ্ধ গম্ভীর শোভা, প্রত্যেক বৃক্ষলতা ও তুষারধৌত প্রস্তরখণ্ডের সুপবিত্র শান্তভাব, এবং উপলব্যথিত-গতি ক্ষীণকায়া এই গিরিনদীর নির্ম্মল

প্রবাহ, এ সমস্ত দেখিলে মনে আর কোনও কথার উদয় হয় না,—শুধু অনাদি অনন্ত মহাপুরুষের মধুর সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এখানে সকলই সহজ, সকলই সুন্দর। পার্ব্বত্য বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণের কি স্বাধীন আনন্দধ্বনি, নদীজলে মৎস্যকুলের কি নির্ভয় সন্তরণ! বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করুন আর না করুন, তাঁহার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই মহতী উক্তি এই পার্ব্বত্য প্রকৃতির প্রাণে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই নীতিকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মনুষ্যের অনুশাসন এখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

চন্দ্রভাগার গতি ধীর; পার্ব্বত্য নদীর লম্ফ ঝম্ফ গতি, সিংহনাদ, ফেনিল তরঙ্গের বেগ, এখানে সে সকল কিছুই নাই। সামান্য শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রভাগা অগ্রসর হইয়াছে। কত বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য যে সেই অল্পজলে খেলা করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। জল সর্ব্বত্রই এক হাঁটু, দুই এক স্থানে একটু বেশী হইতে পারে। জীর্ণ মন্দিরটির এক দিকের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই ভিতর হইতে একটি নির্ঝর বাহির হইয়া চন্দ্রভাগায় মিশিয়াছে। এই নির্ঝরের জল কেমন নির্ম্মল; যেন বীরের শরাঘাতে বিদীর্ণবক্ষা বসুন্ধরার মর্ম্মস্থান হইতে প্রসন্নসলিলা ভোগবতী সমুদ্ভূত হইয়া তৃষাতুরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। ভগ্নমন্দিরের সোপানে বসিয়া, এই ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর অনাবিল পুণ্যপ্রবাহের দিকে চাহিয়া, কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম; এই শুভ্র দিবালোকে বায়ুহিল্লোলিত উন্নত বৃক্ষ-

রাত্রির ঘন পল্লবের সঘন মর্ম্মর শব্দ, নদীর অস্ফুট কলধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া যুগান্তপ্রবাহিত রহস্যভাবের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল, বুঝি ইহা বিশ্বপিতার অনাদ্যন্ত যশোগীতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা হয়। নিকটস্থ গ্রামসমূহের স্ত্রী, পুরুষ ও বালক বালিকারা সকলে সে দিন একত্রিত হইয়া চন্দ্রভাগায় স্নান করে, এবং মন্দিরে। শিবের মস্তকে দুগ্ধ ও বিল্বপত্র "চড়ায়"। এদেশে শিবের মাথায় জল ঢালার নাম "জল চড়ান"। আমি এই সময় একবারও চন্দ্রভাগায় আসিতে পারি নাই; কারণ, ঠিক এই দিনে হরিদ্বারের মেলা আরম্ভ হয়; হরিদ্বারের মেলা দেখিবার লোভ একবারও সংবরণ করিতে পারি নাই, এখানকার মেলাও এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবার সুযোগ হইত, কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুযোগ ত্যাগ করিতাম। বর্ষাকালে আমার বন্ধুগণ দল বাঁধিয়া মৎস্যানুসন্ধানে এই নদীতীরে আসিতেন; কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র স্থানে,—যেখানে "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ"-প্রচারক কিছু কাল যোগসাধনায় কালাতিপাত করিয়াছেন, সেখানে জীবহিংসার জন্য দল বাঁধিয়া আসা আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না।

মহাদেবের মন্দিরমধ্যে বস্ত্রাদি রাখিয়া, এই প্রবল রৌদ্রের মধ্যে শীতে কম্পমান দেহে দুই জনে স্নান করিতে নামিলাম। বাসায় গরম জলে স্নান করাই আমাদের নিয়ম। আমার

সঙ্গী বন্ধু অনেক দিন পরে অবগাহনের সুবিধা পাইয়া হাঁটুজলেই সন্তরণ আরম্ভ করিলেন; এত শীত, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। আমাদের সোৎসাহে দেহমর্দ্দন ও লম্ফ ঝম্ফে মৎস্যকুলের মধ্যে মহা ত্রাসের সঞ্চার হইল; অবশেষে সেই অল্প পরিমাণ জল পঙ্কিল করিয়া আমরা তীরে উঠিলাম। অনন্তর গুড় কড়াইভাজা ভক্ষণের পালা।

আমরা জলযোগ শেষ করিয়া, শিবমন্দিরে দুই জনে শয়ন ও উপবেশনে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিলাম। এখান হইতে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। গৃহের সৌন্দর্য্য বদ্ধ, যেন মায়া-বিজড়িত; সেখানে অল্প দুঃখ শোকে হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, সামান্য সুখেই বক্ষ ভরিয়া যায়, এবং সেই স্তূপাকার সুবর্ণশৃঙ্খলের মোহন ভারের নিম্নে প্রাণ বিসর্জ্জন করা, জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু মুক্ত প্রকৃতির এই লীলা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারা যায়, চতুর্দ্দিকে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, তাহা বাধাবন্ধহীন, মহিমা-ময়, বিচিত্রতাপূর্ণ; গুটি পোকা যেমন তাহার রুদ্ধ গৃহ ভেদ করিয়া বিচিত্রবর্ণ পাখা মেলিয়া গভীর আনন্দে নীল মুক্তাকাশে উড়িয়া যায়, তাহার গৃহের দিকে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ এখানে আসিলে গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। জীবন-মরীচিকার ঘোর পিপাসা বুঝি এই সকল স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রশমিত হয় না!

অনাহারে এখানে রাত্রিযাপনের সঙ্কল্প করা গেল! অপ-রাহ্ণে মন্দিরের বাহিরে বসিয়া দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছি,

এমন সময় একটি লোক আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটেই কোনও গ্রামে তাহার বাসগৃহ; গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা আছে। সে চাষ করে, বাড়ীতে বাগান আছে; বাগানে নানাপ্রকার তরকারী উৎপন্ন হয়; দেরাদুনের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া লবণ তৈল প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনে। এতদ্ভিন্ন তাহার কয়েকটি গরু আছে। কিন্তু সে দুগ্ধ বিক্রয় করে না। আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করিব শুনিয়া, সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং আমাদিগকে এই বিপদপূর্ণ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল। কারণ-স্বরূপ একটি লোমহর্ষণ গল্পও বলিয়াছিল; গল্পটি এই,—

এই মন্দির দিনের বেলা যেরূপ দেখা যায়, রাত্রে সেরূপ থাকে না; রাত্রে ইহার অতি ভয়ানক প্রহরী আছে। সন্ধ্যা হইলেই দুইটি বৃহৎ অজগর সর্প জঙ্গল হইতে মন্দির-বারান্দায় উপস্থিত হয়,এবং উদ্যত ফণায় সমস্ত রাত্রি মন্দির রক্ষা করে। তাহাদের ভয়ে রাত্রিকালে মন্দিরে বাস করা দূরের কথা, সন্ধ্যার পর এ পথে কেহই চলিতে ভরসা করে না। গভীর রাত্রে দেবতারা স্বর্গ হইতে এই মন্দিরে পূজা করিতে আসেন। কৃষকেরা প্রভাতে ফুল ফল পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখে, এবং এক এক দিন রাত্রে তাহাদের দূরস্থ গ্রাম হইতে তাহারা শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি পর্য্যন্ত শুনিতে পায়। একবার এক জন সন্ন্যাসী কাহারও কথা না মানিয়া রাত্রিযাপনের জন্য এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আর সশরীরে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই; প্রাতঃকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাহার মৃতদেহ পতিত ছিল, কে

যেন তাহার শরীরের সমস্ত হাড় চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। যে কৃষকটি আমাদের কাছে গল্প করিতেছিল, তাহার বিশ্বাস, এই মন্দির প্রহরী সর্প তাহাকে জড়াইয়া পিষিয়া মারিয়াছে। কৃষক আরও বলিল, এই মন্দিরটি শিবমন্দির হইলেও ইহা একটি সমাধিমন্দির। অনেক দিন পূর্ব্বে এখানে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতে আরম্ভ করেন; সকলের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী কোনও দেবতা। সন্ন্যাসী এখানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গের কাহাকেও এখানে রাত্রিবাস করিতে দিতেন না; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া লইত। সন্ন্যাসীর গাঁজা, আফিং বা ভাং খাওয়া অভ্যাস ছিল না, তিনি ফলমূলাহারী ছিলেন; নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। সেই সকল গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে সভয়ে দেখিত, সন্ন্যাসীর আশ্রম অনেক দূর লইয়া আলোকাকীর্ণ হইয়াছে, সামান্ত অগ্নিতে সেরূপ আলোক উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে, অথচ সন্ন্যাসীর কুটীরে কখনও এত কাষ্ঠ থাকিত না, যাহা দ্বারা এরূপ প্রচুর আলোকের উৎপাদন করা যাইতে পারে। শুনা গেল, এখনও মধ্যে মধ্যে আলোক দেখা যায়। একবার সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, পাঁচ ছয় মাস পরে এক জন নবীন শিষ্য লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। সে দিন অন্যান্ত শিষ্যগণ রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইল। রাত্রে তিনি ঘোষণা করিলেন, সেই দিনই তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শিষ্যমণ্ডলী এই সংবাদে আকুল

হইয়া উঠিল; তিনি আদেশ করিলেন, নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিয়া তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন, এবং সেই মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা হইবে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবেশন করিলেন; চারি দিকে শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখে, সন্ন্যাসীর প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার গুরুদেবের আদেশ-অনুসারে এখানে এই মন্দির ও এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং তিনি চলিয়া যাইবার সময় আদেশ করিয়া গিয়াছেন, রাত্রিকালে এখানে কেহ বাস না করে। এই জন্য এ স্থান রাত্রিকালে জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আমার সঙ্গী বন্ধুর ঘাড়ে "থিওসফির" বোঝা চাপিয়া আছে; তিনি আগা গোড়া সমস্ত কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। আবার ঠিক এই সময়ে সেই ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড সর্প বাহির হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমাদের সংবাদদাতা কৃষক বলিল, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, তাই সাপ বাহির হইয়াছে, শীঘ্রই বনের মধ্য হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

এই কথা শুনিয়া আমার সঙ্গী আর বিলম্ব না করিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে গাত্রবস্ত্রাদি লইয়া বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। আমার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেখানে থাকিবারও যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে; কারণ, দেখিয়া শুনিয়া এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারে আমার

কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হয়। এখানে থাকিলে মারাত্মক কিছু না হউক, আমাদের কোনও বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে; সুতরাং এখান হইতে উঠিলাম। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কৃষকটি বলিল, দেরাদুন এখান হইতে অনেক পথ, বেলাও আর অধিক নাই, পথে বিপদে পড়িতে পারি, অতএব যদি রাত্রে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে দেরার ফিরিতে পারিব। আমার সঙ্গী সহজেই সম্মত হইলেন। আমার অসম্মতিরও অবশ্য কোনও কারণ ছিল না, বিশেষ এদেশীয় কৃষকেরা অত্যন্ত আতিথ্যপরায়ণ।

আমরা দু'জনে কৃষকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি অল্পপরিসর ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকের বাসগৃহে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে দুইখানি ঘর—একখানিতে রান্না হয়, এবং তিনটি গাই বাঁধা থাকে, অর্থাৎ একখানি পাকশালা ও গোশালা একাধারে উভয়ই, অন্যখানি শয়নগৃহ। কৃষকের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও দুই কন্যা; আমরা গৃহস্বামীর শয়নগৃহের প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া বসিলাম;—সে তাহার স্ত্রীকে আমাদের কথা বলিল। আমাদের বাঙ্গালা দেশের গৃহলক্ষ্মীগণের গৃহে আজ কাল অতিথিসমাগমে তাঁহাদের প্রসন্নমুখে সহসা যে পরিমাণ বিরক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাতে স্বামী মহাশয়েরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে এই পার্ব্বত্য কৃষকপরিবারে সেরূপ কোনও ভাবের পরিচয় না পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত

হইলাম, সেই সঙ্গে বাঙ্গলার মহিলাকুলের সহিত পর্ব্বত-বাসিনী রমণীগণের একটু তুলনাও করিয়া লইলাম। কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা আমাদের সহৃদয়া পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না, অতএব সে কথা এখানে না বলাই ভাল।

কৃষকরমণী সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল; দুইটি সুসভ্য বিদেশী অতিথির কিরূপে অভ্যর্থনা করিবে, এই চিন্তাতেই তাহারা স্বামী স্ত্রী প্রথমে বিব্রত হইয়া পড়িল; কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষকপত্নী ঘরের বাহিরে আসিয়া "রি, রি, রি, রি, রো"—এইরূপ এক শব্দ করিল; উত্তরে দূর হইতে "কু" শব্দ শুনিতে পাইলাম, কে যেন ভাঙ্গা গলায় মিষ্ট কণ্ঠে এই শব্দ উচ্চারণ করিল! গৃহস্বামিনী আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জাবোধ করিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার মানুষের অধিকক্ষণ অভাব ছিল না;—অবিলম্বে কৃষকের হৃষ্টপুষ্টা, উন্নতদেহা গৌরাঙ্গী দুইটি কন্যা তিনটি গাই লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। আমাদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল; তাহাদের পিতা সকল কথা খুলিয়া বলিল। বড়মেয়েটি মার সাহায্যের জন্য রান্নাঘরে গেল, ছোটটি গোবৎস ধরিল, তাহার পিতা গোদোহন করিল। গোদোহন শেষ হইলে আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম; সে সকল কি গল্প? তাহাতে আমাদের শিক্ষা সভ্যতার কোনও কথা ছিল না, জীবনসংগ্রামের গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা যে প্রতিদিন অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি—আমাদের হৃদয়ের সেই ব্যাকুল ক্রন্দন এই

সুখী ও শান্তিপূর্ণ কৃষকপরিবারে ব্যাপ্ত করি নাই। সংসারের অনেক কথা তাহারা বোঝে না,—রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও সমাজনীতির অনুশীলনে ইহাদের মস্তিষ্ক ব্যথিত না হইলেও, ইহাদের দিন বেশ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতেছে। ইহার সহিত কথা কহিয়া আমি বুঝিলাম না, কোন গুণে আমরা শ্রেষ্ঠ; ইহাদের নিষ্ঠা কেমন একাগ্র, ভক্তি কত গভীর, হৃদয় কত উদার ও মহত্ত্বভাবপূর্ণ, এবং বিশ্বাস কেমন অবিচল। আমাদের সংশয়, আমাদের সঙ্কোচ, আমাদের মান-অভিমান-জ্ঞান ইহাদের নাই; ভগবান যদি আমাদের হৃদয়ে এই মূর্খ, পার্ব্বত্যপরিবারের ন্যায় সন্তোষ ও শান্তিদান করিতেন, তাহা হইলে এ শিক্ষা ও সভ্যতার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতাম।

তাহাদের গল্পে তাহাদেরই পুরাতন কাহিনী ধ্বনিত হইতেছিল। তাহাদের সেই সকল গল্পের সহিত তাহাদের গভীর বিশ্বাস বিজড়িত; সে সকল গল্প যুক্তিতর্কের অতীত, কিন্তু তথাপি তাহা কেমন সুন্দর! কৃষকের ছোট কন্যাটি তাহার পিতার নিকট বসিয়া তাহার পিতাকে গল্পে সাহায্য করিতেছিল। হাত মুখ নাড়িয়া সে যখন সালঙ্কারে তাহার পিতার গল্পের অনুবৃত্তি আরম্ভ করিল, তখন আমি অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম।—তাহার বর্ণনভঙ্গী সুন্দর,—কি বর্ণনকৌশল সুন্দর? বাস্তবিক মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার নিটোল দেহে প্রথম যৌবনের উজ্জ্বলকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই চাঞ্চল্যের উপর সুন্দর সরলতা

তাহার মধুর রূপকে অতি সুশোভিত করিয়াছিল। তাহার সরলতা, তাহার রূপমাধুরীও গ্রাম্যভাব দেখিয়া, প্রসিদ্ধ স্কচ কবির কবিতা মনে পড়িয়া গেল :—

"She was a bonnie sweet Sonsie lassie"

কৃষকের ভাষায় সুন্দর পরিচয়; কৃষক কবিই এ সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় উপযুক্ত পাত্র। গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি হইল। ইতিমধ্যে মা ও বড় মেয়ে গরম লুচি, শাকের চাটনি, কাঁচা ভুট্টার একটা ঝাল তরকারী ও গরম দুধ লইয়া, অতিথি-সৎকারের বন্দোবস্ত করিল। আমরা আহারে বসিলাম; ছোট মেয়েটি "এটা খাও, ওটা খাও" বলিয়া জিদ করিতে লাগিল; তাহার কাছে আমরা অত্যন্ত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আহারান্তে আমার সঙ্গী কম্বলের উপর নিজের কাপড়-খানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন। দশ পনর মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন আরব্ধ হইল; দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিদ্রা আমার এরূপ আজ্ঞাকারিণী নহে, (বন্ধুগণ কিন্তু এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না), আমি বসিয়া গৃহস্বামীর সহিত গল্প করিতে লাগিলাম।

বারান্দার এক পাশে জাঁতা ছিল; কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে মেয়ে দুটি সেই জাঁতা ঘুরাইতে লাগিল; প্রথমে তাহারা অস্পষ্টস্বরে কি বলাবলি করিতেছিল। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, আমাদের কথারই আলোচনা করিতেছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া জাঁতা ঘুরা-

ইতে ঘুরাইতে তাহারা গান ধরিয়াছিল। জাঁতা পিষিতে পিষিতে গান করা এ দেশের নিয়ম। প্রথমে দুই ভগিনী অতি ধীরে, সলজ্জভাবে গাহিতে লাগিল, যেন নৈশবায়ুর স্পর্শমাত্রে সেই মৃদুস্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে; কিন্তু ক্রমেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গ্রামের পর গ্রামে উঠিয়া, এই নীরব নিশীথে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে স্বর কেমন সুমিষ্ট, এবং প্রতি চরণের শেষে যে একটি কম্পন, তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন কর্ণে মধুবর্ষণ করে। এতকাল পরে এখনও মধ্যে মধ্যে সেই গীতধ্বনি কর্ণে বাজিয়া উঠে; সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্যকুটীরে সেই নৈশগানের ধুয়া এখনো ভুলি নাই; এখনো মনে পড়ে—

"ওরে ধন দৌলাত"

এবং নিজের অদ্ভুত কবিত্ববলে কত কথাই এই ধুয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া নিজের ভাবুকতা প্রকাশ করি!

কথন ঘুমাইয়াছিলাম, মনে নাই। প্রত্যূষে সঙ্গীর ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, দেরাদূনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের বিদায় লইবার সময় কৃষকের ছোট মেয়েটি বলিয়াছিল, যদি আবার কথনও এ পথে আসি, তবে যেন তাহাদের গৃহে অতিথি হই। পর্ব্বতপ্রান্তের এই অতিথিবৎসল কৃষক-পরিবারের কথা আমার অনেক কাল মনে থাকিবে।

সহস্রধারা।

এক শনিবার অপরাহ্নে আমরা পাঁচ জন প্রবাসী বাঙ্গালী একটি ছোট খাটো সভা করিলাম; সভার উদ্দেশ্য, তৎপর-দিন রবিবারে কোন স্থানে বেড়াইতে যাওয়া,—কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়, এই কথা লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত। দুই জন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা লছমন-সিদ্ধির পাহাড়ে যাইবেন। লছমন-সিদ্ধি দেরাদুন হইতে ছয় মাইল; লছমন নামে এক জন সন্ন্যাসী যেখানে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই সে স্থান পবিত্র। আমরা তিন বন্ধু সহস্র-ধারা-দর্শনের বন্দোবস্ত করিলাম; সহস্রধারা দৃশ্যশোভার জন্য বিখ্যাত। রবিবার অতি প্রত্যূষে লছমন-সিদ্ধির দল রওনা হইবার পর আমরা যাত্রা করিলাম। আজ আমি পদব্রজে চলিতে নিতান্তই নারাজ, কাজেই একখানি একা ভাড়া করিয়া তাহার উপর দেহভার সংস্থাপন করা গেল, এবং বেলা ন'টার সময় রাজপুর নামক একটা সহরে উপস্থিত হইয়া, আর গাড়ী চালাইবার রাস্তা নাই দেখিয়া, আমরা সেখানেই অবতরণ করিলাম।

রাজপুর একটি ছোট সহর; কতকগুলি সাহেবী হোটেল ও ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকায় এই ক্ষুদ্র সহর পরিপূর্ণ। সাহেবেরা মসূরী বা ল্যাণ্ডোর সহরে উঠিবার সময়ে এখানে খানা পিনা করিয়া থাকেন। রাজপুর হইতে ক্রমাগত দুই হাজার ফিট উপরে উঠিলে মসূরী; নিকটে আর কোন বড় আড্ডা নাই বলিয়াই এখানে জনতা কিছু বেশী। রাজপুর দেখিলে মনে হয়, মানবতার ক্ষুদ্র হাত দু'খানিতে প্রকৃতিদেবীর পাষাণময় অঙ্কে একখানি খেলানার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। নির্জ্জন পর্ব্বতক্রোড়ে জনকোলাহলপূর্ণ মানব-অশ্ব-যান-সঙ্কুল এই ক্ষুদ্র জনপদ বেশ মনোরম। বিশেষ শরতের এই উজ্জ্বল প্রভাতে এই পীত রৌদ্রে যখন অনুর্ব্বর পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও কর্ম্মশীল মনুষ্যগণের উৎসাহপূর্ণ মুখ হাস্যময় বোধ হইতেছিল, তখন সুশ্যামল বঙ্গদেশের শরতের প্রভাতে এক মধুর পল্লীর দৃশ্য আমার মনে পড়িতেছিল।

রাজপুর হইতে সহস্রধারা দুই মাইলের কিছু বেশী। আমি পূর্ব্বাপরই হাঁটিতে নারাজ; পাহাড়ে ডাণ্ডী ছাড়া আর উপায় নাই। কাজেই পাঁচ সিকা দিয়া এক ডাণ্ডী ভাড়া করা গেল। শালপ্রাংশু মহাভুজ চারি জন পাহাড়ীর স্কন্ধে সডাণ্ডী আমার এই সুগুরু দেহভার সংস্থাপিত করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। বন্ধুবর ও চ—বাবু মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠী হাতে পদব্রজে চলিলেন; তাঁদের ছত্রটি পর্য্যন্ত আমার মস্তকে ছায়াদান করিতে লাগিল। এই রাজবাঞ্ছিত অভিযানে আমার মনে ভারি আনন্দ বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু

যাহারা এই প্রকারে পরের স্কন্ধে বিচরণ করিয়া, আপনার সাহঙ্কার দৃষ্টির নীচে বিশ্বসংসারকে "নস্যাৎ" করিয়া এক অপূর্ব্ব গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের সেই আনন্দ অনুভব করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। পাহাড় দিয়া নামা উঠা করা এক দুরূহ ব্যাপার, এক একবার উঠিতে যেন বুক ভাঙ্গিয়া যায়, আবার নামিবার সময় বোধ হয়, কে যেন পা দু'খানা ধরিয়া সবলে নীচের দিকে টানিতেছে। আমার মনে ভয় হইতে লাগিল, বুঝি বা ডাণ্ডীওয়ালারা পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যাইবে, আর আমি ডাণ্ডীসমেত ধরণীতলে পতিত হইয়া ইহজন্মের সুখ মিটাইয়া ফেলিবার সুবিধা পাইব। যাহা হউক, বাল্যকাল হইতেই ফিলজফাইজ করার প্রতি আমার কিছু অতিরিক্ত ঝোঁক আছে; কাজেই আমার মনে হইতে লাগিল, পাহাড়ে উঠা নামা পাপ পুণ্যের পথ-মাত্র; পুণ্যপথে উঠা যেমন কঠিন, পাপপথে অবতরণ তেমনি অনায়াসসাধ্য; কিন্তু এই আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মধ্যে বিলক্ষণ একটা বৈসাদৃশ্য আছে। পাহাড়ে নামিতে আরম্ভ করিয়া ইচ্ছা হইলেই আমরা থামিয়া আবার উপরে উঠিতে পারি; কিন্তু পাপপুণ্যের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা সুধু একটুমাত্র ইচ্ছাতেই অতিক্রম করা যায় না; তাহা অতিক্রম করিতে হইলে হৃদয়ের দেববল ও পশুবলের অবিশ্রাম সংগ্রাম অপরিহার্য্য; পাপপুণ্যের গতি সামান্য ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার নহে।

ডাণ্ডীতে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায়

সাড়ে দশটার সময়ে এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হওয়া গেল; আমার সঙ্গিদ্বয় পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই স্থানে ডাণ্ডীত্যাগ। এখানে একটি নির্ঝর পার হইতে হইল; এই নির্ঝরের উজানেই সহস্রধারা। আমরা পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, পর্ব্বতগাত্রে সহস্র প্রকার সুন্দর পুষ্প বিকশিত, আর শত শত সমুন্নত বৃক্ষ তাহাদের সুদূরবিস্তৃত শাখা প্রশাখায় সেই রমণীয় প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; কুলকুল শব্দে ও বিহঙ্গকুলের হর্ষকাকলীতে সেই বিজনপ্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। আমার মনে হইল, ত্রিদেবের নন্দনকানন বুঝি এই রকম, মন্দাকিনীর স্ফটিক-প্রবাহ বুঝি এমনই নির্ম্মল ও শুভ্র, দেববালাগণের অমর সঙ্গীত বুঝি এই বিহগকাকলীর মতই মধুর; এ কাকলী যেন মূক প্রকৃতিমাতার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দগীতি।

সেই নির্ঝরের অল্প উপরেই সহস্রধারার জল পড়িতেছে, এই অর্থে নির্ঝরের নাম 'সহস্রধারা'; সহস্রের অর্থ এখানে অসংখ্য। আমরা যে দিকে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পারেই সহস্রধারা, কিন্তু সম্মুখে আর পথ না থাকায় আমাদের অপর পার অবলম্বন করিতে হইল। এই সময় আমাদের দুই জন পাহাড়ী পথপ্রদর্শক জুটিয়াছিল; সাহেব বা কোন বড়লোক দেখিলে ইহারা পথ দেখাইয়া দেয়, এবং নানাপ্রকার প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া উপহার দেয়; বলা বাহুল্য, এই উপায়ে মধ্যে মধ্যে ইহারা যথেষ্ট

উপার্জ্জন করে। আমাদের যখন ইহারা বড়লোক বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, তখন ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতাকে তারিফ করিতে হয়!

অপর পারে যে পর্ব্বত হইতে অজস্র ধারে জলধারা পড়িতেছিল, আমরা ঠিক তাহারই নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। যে দৃশ্য আমার নয়নসম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত; বাস্তবিকই তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। শুধু চাহিয়া দেখা ও আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া ভিন্ন ভাবিবার বিষয় আর কিছুই থাকে না; কেবল মনে হয় 'Gaze and wonder and adore', প্রাণ তখন আপনা হইতেই বিশ্বপিতার চরণে অবনত হয়। ভগবানের স্নিগ্ধ প্রেম অতি বড় অবিশ্বাসীর হৃদয়ও ধীরে ধীরে আপ্লুত করিয়া ফেলে, এমনই হৃদয়মুগ্ধকারী দৃশ্য, কবিত্বপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধুর বিকাশ, উদার নির্ঝরিণীর মর্ম্মস্পর্শী চিরকলতান! সৃষ্টির কোন্ প্রথম দিনে সমুজ্জ্বল প্রভাতালোকে বুঝি কোন নির্ঝরবালার বক্ষ হইতে পাষাণভার অপসারিত হইয়াছিল, তাই সে তাহার দীর্ঘ কারাবাসের অবসানে নিস্তব্ধ চতুর্দ্দিক তাহার প্রেমানন্দরবে ঝঙ্কারিত করিতে করিতে আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছে। এ গানের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! কত পাখী তাহাদের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার কুলধ্বনির শেষ হয় নাই; কত পূর্ণিমা নিশি নির্ব্বাক হইয়া তাহার স্বচ্ছ রজতস্রোতে চল চল শুভ্র চন্দ্রিকারাশি ঢালিয়া দিয়াছে,

আবেশ-বিহ্বল মৌনদৃষ্টিতে তাহার উচ্ছ্বাস নিরীক্ষণ করিয়াছে, সে উচ্ছ্বাসের আজও শেষ হয় নাই; কত সুন্দর ফুল নির্ঝরের চতুর্দ্দিকে ফুটিয়া তাহার কলতান সুরভিত করিয়া তাহাদের পাষাণশয্যায় দেহলতা পাতিত করিয়াছে, সে অদ্যও ছুটিয়া চলিতেছে!

অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে যে অজস্রধারে জল পড়িতেছে, সে জলধারা সূক্ষ্ম নয়, মুক্তাফলের ন্যায় স্থূলাকারে পর্ব্বতের উপর হইতে ক্রমাগত নীচে পড়িতেছে। এই স্থানে পর্ব্বত সম্মুখের দিকে অনেকটা হেলা, কাজেই তাহার গা হইতে যে সমস্ত জলবিন্দু অবিশ্রান্ত পড়িতেছে, তাহা সোজাসুজি নীচেই পড়ে; অপর পারে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয়, যেন পর্ব্বতের উপর হইতে কে অনবরত মুক্তা ঢালিয়া দিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণতায় তাহা গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে। পর্ব্বত ঠিক সোজা ভাবে উঠিলে এ শোভা দেখিবার সুযোগ হইত না, কারণ, তাহা হইলে, পর্ব্বতের গা বহিয়া জল পড়িত; কিন্তু বিধাতা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জগতের উপভোগ্য করিবার জন্যই যেন পর্ব্বতকে মাটীর সঙ্গে সূক্ষ্মকোণী অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছেন, আর অবিশ্রান্ত মুক্তাস্রোত ধরণীতল সিক্ত করিতেছে; নির্ঝর যেন অস্ফুটস্বরে গাইতেছে,—

'তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী! আপন হৃদয় লয়ে।'

বাস্তবিকই এই পুণ্যনির্ঝরস্রোতে একবার শরীর সিক্ত

করিয়া লইলে আর শূন্যহৃদয়ে, তৃষিতপ্রাণে ফিরিয়া যাইতে হয় না, তখন সত্যই মনে হয়,—

'দেখেছি আজি তব প্রেমমুগ্ধ হাসি,
পেয়েছি চরণছায়া;
চাহি না কিছু আর পূরেছে কামনা
ঘুচেছে হৃদয়বেদনা।'

মুক্তাফলের ন্যায় জলবিন্দু ক্রমাগত নীচে পড়িতেছে, আর তাহার উপর সূর্য্যকিরণসম্পাত হওয়ায় সর্ব্বক্ষণই উজ্জ্বল রামধনু প্রতিফলিত হইতেছে। একে ত সবই খুব সুন্দর, তাহার উপর এই প্রকার রামধনু সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, বিধাতা প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে যেন বিবাহবাসর সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জ্ঞানের সহিত ভক্তি, কবিত্বের সহিত বিজ্ঞান এই মহা পুণ্যক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হইয়া কর্ম্মভূমি উদ্দেশে দ্রুত ছুটিতেছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ ভ্রমণকারী সহস্রধারা দর্শন করিয়া Calcutta Reviewর কোন সংখ্যায় তাহার একটা বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনার কিয়দংশ এখানে ভাষান্তরিত করিয়া দিলে, বোধ হয়, আমার বক্তব্য অনেক পরিষ্কার হইবে। তিনি বলেন, "এই দিন ভ্রমণের প্রারম্ভে আমরা একটি অতি সুন্দর দৃশ্য দেখে অতিশয় পুলকিত হয়েছিলাম। তা আবার একখানি শিলাখণ্ডের পশ্চাৎভাগে লুকায়িত থাকায় অধিকতর মনোরম দেখাইতেছিল। আমরা নিকটে যাইয়া একটা উচ্চ স্থানে দাঁড়াইবামাত্রই

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ের এক স্থান খনন করিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ঝরণা বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহার দুই পাশে দুইটা গহ্বর থাকায় প্রায় এক শত ফিট উচ্চ একটি খিলান হইয়াছে, তাহার তলভাগ প্রস্থে আশি কি এক শো গজ হইবে। উপর পাহাড়ের সকল স্থান হইতেই জল চুয়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া একটি গহ্বরে পড়িতেছে। ঝরণার ঠিক উপরে বড় বড় গাছ ও প্রচুর সতেজ গুল্ম থাকায় কতকটা ছায়া হইয়াছে, আবার সূর্য্যের প্রখর কিরণ জলবিন্দুর উপর উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হইয়া সেই মনোহর দৃশ্যটিকে বর্ণনাতীত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। গাছপালার নানা প্রকার রঙ,আলো ও ছায়ার বৈচিত্র্যে তাহার উপরিভাগ ঠিক 'মাদার অব্ পারলের' মত দেখাইতেছে।"

সহস্রধারার এই মধুর দৃশ্য দেখার পর আমরা Sulpher Spring (গন্ধকের উৎস) দেখিতে গেলাম। সেটি, সহস্রধারা হইতে দূরে নহে। আমরা যাইতে যাইতেই গন্ধকের অতি তীব্র গন্ধ পাইলাম; নিকটে যাইয়া দেখি, একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাত্রস্থ এক ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে জল বহির্গত হইতেছে, সেই জলে গন্ধকের গন্ধ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ পাহাড়ের ভিতর গন্ধকের খনি আছে। সুদৃশ্যের জন্য সহস্রধারা কবি ও ভাবুকের নিকট আদরণীয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকটও তাহার কম আদর নহে। Dr Warth একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত; তাঁহার কাছে কবিত্বের মর্য্যাদা বড় নাই। তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক পুস্তকের (Manual of

Natural Sciences) এক স্থানে লিখিয়াছেন, "চুনের পাথরের ভিতর দিয়া যে ঝরণা বহে, তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিলেই তাহাতে চুণের লেপ পড়ে। রাজপুরের নিকট সহস্রধারায় একটি ঝরণার জলে লৌহ আছে ও অপর একটিতে Hydrogen Sulphideএর গন্ধ পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত দ্রব্যের সঙ্গে সহস্রধারায় চুণের পাথরে যে সাদা Gypsum পাওয়া যায়, তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে।" সহস্রধারার জল চুণের পাহাড় হইতে পড়িতেছে, তাই সে জলের এক আশ্চর্য্য গুণ, গাছ পাতা যাহা কিছু সেই জলে পড়ে, তাহাই চুণ হইয়া যায়। Dr Warth এই রকম কতক-গুলি সংগ্রহ করিয়া Dehra-Dun Forest Schoolএ রাখিয়া দিয়াছেন। আমিও সেই রকম অনেক পাথর আনিয়াছি। একটাতে একখণ্ড কাঠের খানিকটা কাঠ আছে, বাকি অংশ পাথর হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতা ও ডাঁটা বেশ বুঝিতে পারা যায়, অথচ সমস্তটা পাথর; এমন কি,সুন্দর সুন্দর লতা পর্য্যন্ত কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। একটা গাছের পাতা আনিয়াছি, তাহার এক দিক পাথর হইয়াছে, আর এক দিক পাতাই আছে। প্রকৃতি রাজ্যের এই আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিয়া হঠাৎ সঙ্গদোষগুণের কথা আমার মনে হইল, কোমল লতা পাষাণের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও পাষাণ হইয়াছে! কত দেবচরিত্র যে নরপিশাচদের সহবাসে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার সংখ্যা নাই!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহস্রধারা দেখিয়াই ক্লান্ত হওয়া যায় না; সেই আনন্দধারা, প্রেমধারা, পতিতপাবনী পূতধারার নীচে বসিয়া শরীর পবিত্র করিয়া লইবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। আমরা স্নানবস্ত্র পরিধান করিয়া ঝরণার নীচে মস্তক পাতিলাম, মস্তকের উপর অজস্রধারায় জল পড়িতে লাগিল, যেন বহুদিনের পাপ তাপ ধৌত করিয়া আমার এই পাপকলুষিত, সংসারতাপে জর্জ্জরিত জীবনকে এক শুভ্র শান্ত পবিত্র পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল; এই পবিত্র ধারাপাতে শরীর যে প্রকার স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইল, সে স্নিগ্ধতা ও প্রফুল্লতা বহু দিন অনুভব করি নাই; সেখান হইতে আর উঠিয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। স্নানান্তে আহারাদির পর এখানে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। প্রাণ আর এ স্থান ছাড়িতে চাহে না; সুধু ইচ্ছা করে, নির্ঝরের কুলধ্বনি, বিহঙ্গের কূজন, আর প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভাকুল সমীরণের মৃদুহিল্লোলবিক্ষুব্ধ বৃক্ষপত্রের অবিরাম সর্ সর্ শব্দে, এই দুঃখশোকসন্তপ্ত, সংসারসংগ্রামে নিপীড়িত হৃদয়ের ক্লান্তি দূর করি।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া যে বৃক্ষতলে ডাণ্ডী রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেখানে ফিরিয়া আসিলাম। তখনও খানিকটা বেলা ছিল, তাই বৃক্ষমূলে একটু বিশ্রাম করা গেল। ফিরিবার সময়ে আমার সঙ্গী একজন বন্ধুকে ডাণ্ডীতে চড়িবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ করিলাম; অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি ডাণ্ডীতে উঠিলেন। আমি

তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলাম। খানিক অগ্রসর হইয়া দেখি, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড চড়াই। এই স্থান হইতে পাহাড়ের গা দিয়া উপরে উঠিবার পথ, কিন্তু রাস্তা ভারি গড়ানো; সেই পথে উপরে উঠিতে গেলে বুকের হাড়গুলি মট্‌মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে মনে হয়। ডাণ্ডী আগে চলিয়া গেল, আর আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চড়াইয়ের এক অষ্টমাংশ উঠিতেই আমার প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইল। একে দেহভার নিতান্ত লঘু নহে, তাহার উপর এই প্রকার ভ্রমণ কখন অভ্যাস নাই, কাজেই পা আর চলে না; মধ্যে দুই তিনবার বসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই প্রবল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে যতটুকু উঠিয়াছি, তাহা অতি সামান্য পথ; এতেই এত গলদ্‌ঘর্ম্ম! কি করা যায়, তখন জরাজীর্ণ, শুষ্কদেহ চিররোগীর মত অতি ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; দেখি, সম্মুখের বাঁকের মাথায় আমার বন্ধুটি ডাণ্ডী নামাইয়া বসিয়া আছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই দৈববাণী করিয়াছিলেন যে, চড়াই উঠা আমার মত বীরপুরুষের কর্ম্ম নয়; কিন্তু আমি তাঁহার কথার ঘোর প্রতিবাদ করায় তিনি আমার অবিবেচনার ফলভোগ করিবার একটু অবসর দিবার জন্যই এই পথটুকু ডাণ্ডীতে আসিয়াছিলেন, এবং আমার শোচনীয় অবস্থার বিষয় কতকটা অনুমান করিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছিবামাত্রই তিনি দুই একটি ভৎসনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়া ডাণ্ডীতে উঠিয়া বসিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন, আমিও বাক্যব্যয় না করিয়া নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম। তিনি পদব্রজে চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে দেখিতে দেখিতে যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। অনেক দিন পাহাড়ে বাস করিয়া এবং সরকারী কার্য্যোপলক্ষে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের দুরারোহ স্থান সকলে যাতায়াত করায়, এ রকম ভ্রমণ তাঁহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আমি উপরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি অনেক পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিয়াছেন।

রাজপুর হইতে আমাদের বাসা প্রায় ছয় মাইল; রাজপুরে একখানি এক্কা ভাড়া করা গেল। সূর্য্য প্রায় অস্ত যায়, এমন সময়ে আমাদের এক্কা রাজপুরের উচু নীচু রাস্তা দিয়া দেরাদূনের দিকে আসিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সান্ধ্যপরিচ্ছদ-পরিহিত দুই পাঁচ জন সাহেবকে এদিক ওদিক যাইতে দেখিলাম; কনককেশী ক্ষীণাঙ্গী মেম সাহেব আমাদের স্যন্দনের ঘর্ঘর শব্দে চকিত নেত্র উত্তোলন করিয়া একবার আমাদের দিকে চাহিলেন।

ধীরে ধীরে চারি দিক অন্ধকার হইয়া আসিল; কেবল পশ্চিম আকাশে একটু আলো আছে; কিন্তু সে লোহিত রাগও ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল, এবং এতক্ষণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলি অস্তমিত তপনের শেষ কিরণচ্ছায়ায়

রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে বিবর্ণ হইয়া দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আকাশে তারকার নীরব দৃষ্টি, বায়ুসঞ্চালনে পার্ব্বত্য বৃক্ষপত্রের সর্‌সর্‌ কম্পন ও আমাদের একার ঘর্ঘরধ্বনির মধ্য দিয়া বশিষ্ঠাশ্রম-প্রত্যাগত রাজা দিলীপের ন্যায় আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতবাসীদের ক্ষুদ্র কুটীরে মৃৎপ্রদীপগুলি জ্বলিয়া উঠিল, তাহার দুই একটা রশ্মিচ্ছটা আমাদের গাড়ীতে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং কতকগুলি পার্ব্বত্য বালক বালিকা তাহাদের অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও সরলতাপূর্ণ কচি মুখগুলি লইয়া উৎফুল্ল ভাবে আমাদের গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। আজ এই পর্ব্বতপ্রান্তস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলিতে আলোকরশ্মি ও পার্ব্বত্য বালকবালিকাগণের সরল মুখচ্ছবি এবং কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া কত শরদাগমে গৃহে প্রত্যাগমনের কথা মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে দিনে আর এ দিনে কি গভীর ব্যবধান! এই ব্যবধানের উপর একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন আর কেহ সেতু নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম নহে।

আমাদের যান অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, সুতরাং প্রাচীন চিন্তাগুলিকে বিদায় দিয়া অবতরণ করা গেল, এবং স্মিতমুখে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে এই পর্য্যটনসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

মুশৌরী।

যে দিন আমি সর্ব্বপ্রথম পর্ব্বতারোহণ করি, আমার জীবনের সে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া অক্লান্তভাবে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করার আরম্ভ সেই দিনে। পর্ব্বতবিচরণের আনন্দ তেমন অতি অল্পবারই অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এখন স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে, তত ভয়ও আর কখন অনুভব করি নাই। আসন্ন মৃত্যুস্রোত কতবার জীবনের চতুর্দ্দিকে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিপদের উপর বিপদ দুর্গম ও নির্জ্জন শৈলপথে কত সময় আমার ক্লিষ্ট, ক্ষিপ্ন, অবসন্ন দেহটিকে চূর্ণ করিয়া দিবার সম্ভাবনা জানাইয়াছে; অটল সহিষ্ণুতার সহিত ধীরভাবে সে সকল সহ্য করিয়াছি। তাহার পর যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার সেই পুরাতন জীবনের অবসান হইয়াছে; জীবনের আর একটি অভিনব যুগে পদার্পণ করিয়াছি; কিন্তু সেই দিনে,—আমার পর্ব্বতারোহণের প্রথম দিনে, যে ভয় ও সঙ্কোচ আমার কৌতুকোদ্দীপ্ত হৃদয়ের মধ্যে হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা অভিনব।

আমি যে দিন প্রথমে দেরাছনে যাই, সে যে খুব বেশী দিনের কথা, তাহা নহে; তাহার পূর্ব্বে পর্ব্বতারোহণ দূরের কথা, পর্ব্বতদর্শনও কোন দিন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। মনে পড়ে, বাল্যকালে হাবড়ায় রেলে চড়িয়া একবার বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পশ্চিমে কে কত দূর বেড়াইয়াছে, সেই কথা লইয়া বর্ষাকালে একদিন টিফিনের ছুটির সময় ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে ভারি তর্ক উঠিয়াছিল। সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার পর আমি বলিলাম, "আমি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়াছি,—সে অনেক দূর।" আমার এই সৌভাগ্য কয় জন বন্ধুর প্রীতিকর হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু দুই এক জন বয়োবৃদ্ধ বান্ধবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই কথায় হয় ত একটি শ্বেত সৌধ, সৌধশিখরে একটি সুসজ্জিত কক্ষ, এবং সেই কক্ষস্থিত একটি অলোকসুন্দরী রাজকন্যার চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল; বুঝি রত্নদীপের উজ্জ্বল আলোক তাহার সুন্দর মুখ এবং আগ্রহস্ফুরিত চক্ষুর উপর পড়িয়া, তাহা উদ্ভাসিত করিয়াছিল; কে জানে, যুবতী তখন মাল্যরচনা করিতেছিলেন, কি কাহারও আশাপথ চাহিয়া ছিলেন। যাহাই করুন, সেই বাল্যকাল হইতে আমার মনে কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল; আমার নবজাগরিত কল্পনায় দেখিতে পাইতাম, ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কটিতটে মেখলার ন্যায় শ্যামল তরুরাজি, ঊর্দ্ধে তুষারমণ্ডিত শুভ্র কিরীট, উপত্যকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, এবং সেই সকল

কুটীরপ্রান্তে ও বনান্তরালে দণ্ডায়মান পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দ। গৃহকোণবাসী বালকের অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহারা প্রবাসের আনন্দ বিতরণ করিত। কে জানিত, এ কল্পনা একদিন সত্যে পরিণত হইবে?

কিন্তু আমার জীবনমধ্যাহ্নে সত্য সত্যই এমন এক দিন আসিল, যে দিন আমি মাতৃভূমির স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া, সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে শান্তি এবং শৈত্য লাভের আশায় উপস্থিত হইলাম। অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের ক্রোড়বর্ত্তী দেরাদুন সহরের নিভৃতনিবাস অতীব মনোরম বলিয়া বোধ হইল।

দেরাদুনে আসিলাম বটে, কিন্তু পর্ব্বতারোহণের সুখলাভ করিতে পারিলাম না। দেরাদুনে আসিতে শিভালিক পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্য দিয়া আসিতে হয়; কিন্তু শেষরাত্রে ডাকের গাড়ীতে দুরন্ত শীতের মধ্যে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। একদিন স্থির করিলাম, পদব্রজে গিরিপর্য্যটন করিতে হইবে।

দেরাদুন হইতে বেড়াইতে যাইবার প্রধান স্থান মুশৌরী সহর। মুশৌরী ইংরাজরাজকর্ম্মচারিবর্গের গ্রীষ্মাবাস; দেরাদুন হইতে অধিক দূর নহে, বার মাইল মাত্র। বিশেষতঃ প্রবাসীর নিকট তাহা একটি দেখিবার জিনিষ, সুতরাং দেরাদুনে আসিয়া তাহা দেখিবার জন্ত অধীর হইয়া পড়িলাম।

এখনও বেশ মনে আছে, এক শুক্রবারে বেলা প্রায় ১টার সময় মুশৌরী দেখিবার জন্ত দেরাদুন হইতে বাহির

হইলাম। তখন গ্রীষ্মকাল—দেরাছুনে বেশ গরম পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের রৌদ্রে পর্ব্বত যেমন ভয়ানক গরম, রাত্রে তাহা আবার তেমনই শীতল; উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব; দেরাদুনে এই বিশেষত্বের আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায়। আমি গ্রীষ্মোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহির হইলাম, বন্ধুটির অনুরোধে কিছু কিছু গরম কাপড়ও সঙ্গে লওয়া গেল। দেরাদুন হইতে একখানি ট্যাণ্ডাম্ ভাড়া করিয়া রাজপুরে উপস্থিত হওয়া গেল। রাজপুর মুশৌরী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। দেরাদুন হইতে ইহা প্রায় পাঁচ মাইল; এখান হইতে সাত মাইল চড়াই অতিক্রম করিলে মুশৌরীতে উপস্থিত হওয়া যায়।

রাজপুর একটি সুন্দর সহর। বাড়ীগুলি ছোট ছোট, পথ ঘাট পরিষ্কার। অনেক ছোট বড় ইংরাজ এখানে বাস করেন। রাজপুরে আসিয়াই ট্যাণ্ডম্ ছাড়িতে হইল; কারণ, ট্যাণ্ডমে চড়িয়া এ চড়াই অতিক্রম করা যায় না। কাজেই এখানে আসিয়া পর্ব্বতারোহণের উপযোগী যানে আরোহণ করিতে হয়। এই অভিপ্রায়ে এখানে ডাণ্ডী, ঝাপান, ঘোড়া, এই তিন রকম যানের বন্দোবস্ত থাকে। কষ্টসহ, সবলকায় পাহাড়ীরা সেই সকল যান আরোহী সহিত স্কন্ধে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পর্ব্বতারোহণে পারদর্শী, তাহারা কোন প্রকার যানের সাহায্য না লইয়া পদব্রজেই মুশৌরীতে যাত্রা করে; কিন্তু

সেরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তখন পর্ব্বতারোহণে আমার "হাতে খড়ি"ও হয় নাই, সুতরাং সেই সাত মাইল চড়াই পদব্রজে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ করিলাম। প্রথমেই একটি যানের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল। আমরা দুটি বন্ধুতে অনেক পথ, অনেক আড্ডা, হোটেলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যত দোকান ছিল, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু একখানিও যানের সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটি একটু আশ্চর্য্য হইলেন; কারণ, তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরূপ যানের অভাব আর কখনও তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। আমি আজ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি, সুতরাং সেই জন্যই হয় ত নিরাশ হইতে হইল ভাবিয়া আমার মন বড়ই বিষণ্ণ হইল। আমি কবিবর ভারতচন্দ্রের একটি পুরাতন কবিতার আবৃত্তিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রসিকতাপ্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর তাঁহার একজন পরিচিত নাগরিকের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, সেদিন সকালে একজন অজ্ঞাতনামা রাজা রাজপুরে আসিয়া দেশের সমস্ত ডাণ্ডী এবং ঝাপান লইয়া দলবলের সঙ্গে মহাসমারোহে মুশৌরী গিয়াছেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম; দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, অথচ মুশৌরী না দেখিয়া ফিরিব, ইহা অসম্ভব। আবার সাত মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া সেখানে পদব্রজে যাওয়া, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অসম্ভব।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর বন্ধুটি বলিলেন, একমাত্র উপায় আছে। আমার মনে বড় আশার সঞ্চার হইল; কিন্তু যখন তিনি বলিলেন যে, "অশ্বারোহণে যাওয়াই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত", তখন একেবারে বসিয়া পড়িলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে উঠা—এমন অসম্ভব কথা ত কখন শুনি নাই! ভায়া রহস্য করিতেছেন ভাবিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিলাম; কিন্তু তাঁহার ভাবে রহস্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আমি সাহস করিয়া বলিলাম, "ভাই! এ চতুষ্পদ জন্তুগুলিতে চড়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ, তাহাতে আবার পাহাড়ের উপর; আমার দ্বারা তাহা হইবে না।" বন্ধুটি অনেক ভরসা দিতে লাগিলেন, আমি কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইলাম না। ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিয়া ধরিবার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও বিশেষ চিন্তার কোন কারণ ছিল না; বলা বাহুল্য, অনেকবার ঘোড়ায় চড়িবার সখ হইলেও, এই গুরুতর অভাবের জন্য সখ মিটাইতে পারি নাই, এবং "শৃঙ্গিণাম্ শস্ত্রপাণিনাম্" চাণক্য পণ্ডিতের এই অতি নিরাপদ নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি!

আমার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বন্ধু আমাকে একেবারে একটা ঘোড়ার আড্ডায় লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, প্রকাণ্ডকায় কতকগুলি ঘোটক বাঁধা আছে; যেমন দৈর্ঘ্য, তেমনই বিস্তার; কাল, লাল, সাদা, নানা রকম রঙ্গের; দেখিলে বোধ হয়, সকলগুলিই উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর।

বন্ধুবর একটি সুন্দর অশ্ব বাছিয়া লইলেন, এবং আমার জন্যও একটি মনোনীত করা হইল। সেই শ্বেতকায় তেজস্বী অশ্ব দেখিয়া আমি বিস্ময়ে ও ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম, পর্ব্বতারোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণরূপ পরিপাক হইয়া গেল।

যাহা হউক, যখন দেখিলাম, অশ্বারোহণ ভিন্ন আর উপায় নাই, তখন একটি ছোট রকমের অশ্বের জন্য উমেদারী করিতে লাগিলাম। কিন্তু সহিস বলিল যে, "এ ঘোড়া 'বহুত ঠাণ্ডা'।" বন্ধু নির্ভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন; আমি দুই তিন বার চেষ্টার পর দুই জন সহিসের সাহায্যে ঘোড়ার পিঠে উঠিলাম। আমার সৌভাগ্যবশতই হউক, কি স্বভাবতঃ শান্ত বলিয়াই হউক, অশ্ববর কোন প্রকার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল না। বন্ধু অগ্রসর হইলেন, আমিও ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম; ক্রমে অল্পে অল্পে সাহসের সঞ্চার হইল; মনে হইতে লাগিল, বাল্যকাল হইতে ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস না রাখিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছি; আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুতাপেরও উদ্রেক হইল।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই, এক স্থানে যাত্রীদিগকে 'টোল' দিতে হয়। সেখানে একটু থামিয়া টোলের পয়সা দিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। অশ্ব অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে, কত লোক আমার পশ্চাতে আসিয়া অগ্রে চলিয়া গেল। বন্ধুবর বেগে অশ্ব চালাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার অশ্ব কখন বেগে, কখন মন্থরগমনে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া চলিতে লাগিল,

কখন বা কঠিন পাথরের উপর দুই এক বার পদস্খলন হইল; আমি কিন্তু সমানভাবে চলিতেছি। বন্ধু দুই এক বার বক্র পার্ব্বত্যপথের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া পড়েন, আবার আমাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্ব ফিরাইয়া সতৃষ্ণনয়নে আমার অপেক্ষা করেন। পথ অত্যন্ত বন্ধুর দেখিয়া, সাহিসকে সঙ্গছাড়া করিতে আমার সাহস হয় নাই; আমার অনুরোধে সে বেচারী ক্রমাগত ঘোড়ার লেজ ধরিয়া চলিতেছে। তাহার গুম্ফশোভিত কাল গম্ভীর মুখখানি দেখিয়া, আমার সন্দেহ হইল যে, সে প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মৃত্যুকামনা করিতেছে। তাহার এই নীরব অভিসম্পাত হইতে উদ্ধারলাভের কোনও উপায়ই দেখা গেল না; বাস্তবিক আমার মত আনাড়ী সওয়ার সে তাহার সহিস-জন্মে আর দ্বিতীয় দেখে নাই। তাহার এই অসম্ভব বিরক্তিনিবারণের জন্য, আমি তাহাকে সম্ভবমত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম; তাহাতে তাহার সেই বিকটমুখ হাস্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ঘোড়াওয়ালার চাকর মাত্র, মাসিক বেতন ভিন্ন তাহার অধিক কিছু প্রাপ্তির আশা ছিল না, সুতরাং বকৃশিস্ তাহার উপরি-পাওনা; অতএব আমাকে বিশেষ সন্তর্পণে লইয়া যাইবার জন্য সে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইল। বকৃশিসের প্রলোভনে সহিসকে রাজী করিলাম বটে, কিন্তু ঘোটকটি এতক্ষণ পরে আমার উপর গর্‌রাজি হইয়া উঠিল; তাহাকে প্রলোভিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। যতই উপরে উঠিতে লাগিল, ততই তাহার অবাধ্যতা ও

উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বোধ করি, এমন ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত চলা তাহার কখনও অভ্যাস ছিল না, এমন অকর্ম্মণ্য সওয়ারও সে কখনও লাভ করে নাই। আমি তাহাকে যতই পাহাড়ের উপর পথের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, সে ততই গিরিগহ্বর ও অধিত্যকার দিকে ছুটিতে চায়। উপায়ান্তর না দেখিয়া সহিসের শরণ লইলাম। সে স্মিতমুখে ক্রমাগতই বলে, "কুচ ডর্ নেহি।" আমার প্রাণে কিন্তু "ডরের" অভাব ছিল না। সেই নির্ভীক কঠিনদেহ পাহাড়ীর আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক কোন্ নির্জ্জীব অনভ্যস্ত বঙ্গবীর অশ্বের উপর আসন স্থাপন করিতে সক্ষম হয়? প্রতি পদক্ষেপণেই মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি আমার পতন ও মূর্চ্ছা হয়!

এইরূপ "সসেমিরা" অবস্থায় কিয়দ্দূর অতিক্রম করার পর দেখিলাম, দুই জন সাহেব অশ্বারোহণে পশ্চাৎ দিক হইতে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহাদের অশ্বদ্বয় সবেগে আসিতেছিল, এবং তাঁহাদিগের উচ্চ সহাস্য কলধ্বনিতে সেই নিভৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। দেখিয়া আমি সঙ্কুচিতভাবে পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। পশ্চাতের ঘোড়া ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া যে সম্মুখের অশ্বারোহী এক পাশে স্থিরভাবে অপেক্ষা করে, এ দৃশ্য বোধ হয় উক্ত পুরুষপুঙ্গবদ্বয়ের নিকট অভূতপূর্ব্ব; তাই তাঁহারাও অশ্বের বেগ সংবরণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোককে

প্রশ্নকৌতূহলে বিব্রত করা নীতিসঙ্গত না হইলেও, আমার গন্তব্যস্থান কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের জেরায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, বেলা দুইটার সময় রাজপুর ছাড়িয়া এই সাড়ে চারিটার সময় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ কথা শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা বুঝিলেন যে, আমার অশ্বারোহণের সখ পর্ব্বতারোহণের সহিষ্ণুতা অপেক্ষা অল্প নহে; সুতরাং আমার ন্যায় ওস্তাদ অশ্বারোহীকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করা সেই রসিক খৃষ্টশিষ্যদ্বয়ের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এক জন বলিলেন, "Babu, you should have started in the morning to reach the station at 5." আর এক জন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "It is better for you to go back,"—তাঁহাদের এই অযাচিত উপদেশের জন্য যথাযোগ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমি আবার ঘোড়া চালাইলাম, আমার সঙ্গী বন্ধু তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি "ঝরিপানি" নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর আমার জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার জন্য ভদ্রলোকের বিষম বিপদ, আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেও পারেন না, আবার আমাকে সঙ্গে লইয়া চলাও অসম্ভব। "ঝরিপানি" হইতে মুশৌরী অতি নিকটে। যখন আমরা মুশৌরী সহরের মধ্যে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। অপরাহ্ণে মুশৌরী পাহাড়ের দৃশ্য অতি বিচিত্র এবং আনন্দপ্রদ। মুশৌরী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজের

গ্রীষ্মাবাস। শিমলায় বড়লাট সাহেব গ্রীষ্মকালে সদলে বাস করেন ; দার্জ্জিলিংয়ের বিরামকুঞ্জে আমাদের বঙ্গেশ্বর গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন ; নাইনিতাল উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট-লাটের নৈদাঘ-নিকেতন ; আর এই মুশৌরী-সহর লাটদলের নিম্নশ্রেণীস্থ সাহেব বিবির আড্ডা। গ্রীষ্মকালেই এই আড্ডা জমকাইয়া উঠে। এই সময় মুশৌরী তন্বী নাগরীর ন্যায় যেরূপ সুসজ্জিত হয়, অমরসুন্দর হর্ম্ম্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দনকাননতুল্য বিলাস-উপবনে যে অশ্রান্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বসিত হর্ষের অবিরাম স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার ঠিক বর্ণনা করিতে হইলে, প্রচুর শক্তি ও লিপিকুশলতার প্রয়োজন। এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, এক জন নবাগত প্রবাসীর চক্ষে বিলাসিতা ব্যতীত আর কিছুই এখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্থির, শান্ত, নির্ম্মল সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন পৃথিবী একটি উদার গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, নিস্তব্ধ ধরাতল ও অন্ধকারসমাচ্ছন্ন উন্মুক্ত আকা-শের মধ্যে একটি পবিত্র মিলন সংঘটিত হয়, চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বত ও তাহাদের অঙ্গস্থিত স্তূপাকার নিশ্চল বৃক্ষরাজি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় নয়নসমক্ষে প্রতীয়মান হয়, তখন আমাদের কর্ম্মশ্রান্ত, অবসন্ন হৃদয়ও ধীরে ধীরে সংযত হইয়া আসে ; একটি অপার্থিব, পবিত্র এবং শান্তিময় ভাবে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ; চিরমঙ্গলময়ের উদ্দেশে আমাদের মস্তক অবনত হয়। তখন যে সঙ্গীত আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, তাহা পবিত্র এবং শান্তিময়, গম্ভীর এবং প্রশান্ত

মহিম্নঃস্তোত্র ; দেবালয়ের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি সে সময় আমাদিগকে যে সুখ এবং আনন্দ প্রদান করে, অন্য কোন প্রকার বাদ্যোদ্যম সে আনন্দদানে সক্ষম নহে।

অতএব যাঁহারা শান্তির অন্বেষণে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুশৌরী সহরে উপস্থিত হন, তাঁহারা কখন এখানে আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। ঐহিক সুখই এখানে সকলের একমাত্র লক্ষ্য। ইংরাজসমাজ লইয়াই এখানকার সমাজ, এখানকার অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই ইংরাজ। সুদূর শ্বেতদ্বীপ কখন দেখি নাই, দেখিবার আশাও নাই; কিন্তু এখানে আসিয়া মনে হইল, ইংলণ্ডের পুরুষ ও ললনাগণের অধ্যুষিত কোন একটি গিরিউপত্যকা কোন ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী শক্তির প্রভাবে হিমালয়ের বক্ষোদেশে আনীত হইয়াছে। রাজপথগুলি সুন্দর; গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছবির মত সুরম্য; বিরাম উপবন, লতাবিতানমধ্যবর্ত্তী নিভৃত পুষ্পকানন, খেলিবার মাঠ, ভ্রমণের জন্য নির্জ্জন নেপথ্য কিছুরই অভাব নাই। সন্ধ্যাকালে আলোকমালায় পথগুলি আলোকিত হইয়া উঠে; গৃহকক্ষ হইতে বাতায়নপথে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এ সময় কোন আনন্দভবন হইতে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হয়; কোন গৃহ হইতে সুশ্রাব্য বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়; কোন নির্জ্জন নিকুঞ্জে প্রেমিকযুগল কাষ্ঠাসনে বসিয়া আপনাদের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন; রাস্তার ধারে তিন জন যুবতী দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন, এবং মৃদু হাস্যধ্বনিতে গল্পকে

আরও মধুর করিয়া তুলিতেছেন। এক জন সাহেব একাকীই পর্ব্বতের পাশ দিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছেন; আর এক দিকে একটি ক্ষীণাঙ্গী ইংরাজললনা কতকগুলি ফুল হাতে লইয়া, মৃদুমন্দগমনে অগ্রসর হইয়াছেন; একটি সাহেব যুবক তাঁহাকে দেখিয়া একটু সম্ভ্রমের সহিত মাথা হইতে টুপি উঠাইলেন; রমণী স্মিতমুখে একবার মস্তক নোয়াইয়া আবার অভীষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন। এখানে যেন দারিদ্র্যদুঃখ নাই, কাহারও মনে বিষাদ কি কষ্ট নাই, সকলেই আনন্দোৎফুল্ল; দেখিয়া মনে হয়, এ কি ইন্দ্রপুরী, অথবা অমরভবন!

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। সাহেবদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তার উপর উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটিতেছে, আবার আসিয়া আয়ার হাত চাপিয়া ধরিতেছে। লিভারী-পরা অহঙ্কারগর্ব্বিত দুই একটি সাহেবের খানসামা প্রভুর শিশুপুত্রকে ক্ষুদ্র গাড়ীতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে; ছেলেদের কাহারও হাতে একটা বাঁশী, কাহারও কোলে কাপড় চোপড় পরান একটা চীনের পুতুল। রাস্তার উপরই সাহেবদের ছেলেদের জন্য একটা স্কুল। কয়েকটা বওয়াটে ছেলে সেই স্কুলের পাশে দাঁড়াইয়া চুরুট ফুঁকিতেছিল ও নানা ভঙ্গীতে গল্প করিতেছিল। দুই জন কৃষ্ণকায় অশ্বারোহী সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক জন আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, "What is the time by your horse,

Sir ?" আমার সঙ্গী বন্ধুটি নিতান্ত কম নহেন, তিনি উত্তর দিলেন—"3 feet 5 inches, my sons"—ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। লাইব্রেরী বাজারের একটু দূরে একটা গির্জ্জাঘর আছে, সেখানে একটু 'উৎরাই' নামিতে হয়। আমার সঙ্গী বন্ধু চারি দিক দেখিতে দেখিতে একটু অসতর্কভাবে চলিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার অশ্বের সামান্য পদস্খলন হইল, আর তিনি একেবারে ভূমিসাৎ! অন্য স্থান হইলে কোন আপত্তি ছিল না, লাফাইয়া উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িলেই চলিত; কিন্তু সন্ধ্যার সময় গির্জ্জার সম্মুখে কতকগুলি সাহেব বিবির জটলার মধ্যে পতন কিঞ্চিৎ কষ্টকর। তাঁহাকে পড়িতে দেখিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিল, তাঁহার দুর্দ্দশায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া যথেষ্ট ভয়ও হইয়াছিল। যাহা হউক, বন্ধুবর পুনর্ব্বার তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে এক চাবুক কশাইয়া দিলেন, যেন তাহার অপরাধের জন্যই এমন একটা বিভ্রাট ঘটিল! তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত অশ্বারোহীর যখন এই অবস্থা, তখন আমার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! বহুকষ্টে অশ্ব বেচারীকে স্থির রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম।

মুশৌরী সহরে বাজার ও দোকানের অভাব নাই। হোটেলের "বিলিয়ার্ড রুম" আলোকময়, কোনটাতে খেলোয়াড়গণ আসিয়া জুটিয়াছেন, কোনটাতে তখনও জুটেন নাই।

এই সকল হোটেলের মধ্যে Himalayan Hotel সর্ব্বাপেক্ষা বড়; তাহার খ্যাতিও বহুদূরবিস্তৃত।

রাত্রি বেশ সুনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে কিঞ্চিৎ গাত্রবেদনা অনুভূত হইল, কিন্তু তাহাতে ভ্রমণের ব্যাঘাত ঘটিল না। একটু বেলা হইলে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে The great Trigonometrical survey আফিসের মান-মন্দির দেখিতে যাওয়া গেল; অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, সেগুলি কি সুন্দর! শুভ্রকঠিন তুষাররাশির উপর বিন্দু বিন্দু শিশির সঞ্চিত হইয়াছে,তাহার উপর প্রভাত-সূর্য্যের লোহিত প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, শৈলশৃঙ্গগুলি ক্ষণে ক্ষণে নূতন বর্ণ ধারণ করিতেছে;—শোভা অতুলনীয়। দূরের ছোট ছোট গ্রামগুলি কেমন শোভাময়, সেই সকল কুয়াসাচ্ছন্ন বৃক্ষান্ত-রালবর্ত্তী গ্রাম যেন শৈশবস্মৃতির সুরম্য শুভ্র যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, অল্প অল্প ব্যবধানে অনন্ত অরণ্যশ্রেণী।

অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইলাম; সেই আনন্দ-উৎসব, সাহেব বিবির তেমনি জটলা, হাস্য কৌতুক। সমস্ত দুঃখদারিদ্র্যকে ভারতের সমভূমিতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া ইহারা দিবারাত্রি বিরাম উপভোগ করিতেছে। শ্রান্তিকাতর অশান্ত হৃদয় লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের হর্ষকোলাহল শুনিতে লাগিলাম; তাহাদের এই উৎসাহ, এই অশ্রান্ত আমোদ, আমার বিস্ময়বিমুগ্ধ চক্ষুর সম্মুখে একটি উৎসবপূর্ণ

অভিনয়দৃশ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; আমি পথ-প্রান্তবর্ত্তী নীরব দর্শক। হায়, ইহারা যদি একবারও ভাবিত, এমন অভিনয়ও ফুরাইয়া যায়, এবং কালের একটিমাত্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে উৎসবের উজ্জ্বল দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হয়!

তিহরী।

আমি এবার পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উৎস দর্শন করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। পর্ব্বতপ্রদেশে একটা গন্তব্য স্থান স্থির না করিয়া চলা যায় না; যে দিকে চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিব, এরূপ বন্দোবস্ত হইলে, চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন বৃক্ষতলে ও পর্ব্বতগহ্বরেই কাটিয়া যায়। আর অনাহারে ও পরিশ্রমে সে দিন কয়টিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। আমার যে তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল, এমন নহে। অতৃপ্তি অশান্তি লইয়া আমি হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিতে পারিতাম না। স্বর্গের সুন্দর মনোমোহন দৃশ্যপট আমার নয়নসমক্ষে নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া আবির্ভূত হইত, আমার অশান্ত প্রেমহীন নীরবদৃষ্টির তাচ্ছীল্য তাহাদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিত; নন্দনকাননের অপূর্ব্ব শোভা আমার তাপিত বক্ষে প্রেমের সঞ্চার করিত না। এত বিড়ম্বনা এত নিরাশাকে সঙ্গী করিয়া পথ চলিবার কষ্ট বুঝাইবার নহে—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কাহাকেও যেন বুঝিতে না হয়।

গঙ্গোত্রী যাইবার সর্ব্বজনপরিচিত পথ একটি, তবে পর্ব্বতবাসিগণ হিমালয়ের বক্ষে আজন্মপ্রতিপালিত, তাহারা নিজেদের জন্য সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র পথের বন্দোবস্ত করিয়া লয়। সে পথে আমার ন্যায় অন্নভোজী বাঙ্গালী বীরের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা প্রতিবেলায় সেরভর আটা ও তদুপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরও চলিবার সাধ্য নাই; সে সকল 'পাকদাণ্ডী' দৃঢ়কায় ক্ষুদ্রদেহ পর্ব্বতবাসিগণেরই যাতায়াতের পথ। গঙ্গোত্রীর যাত্রিদল হরিদ্বার হইতে দেরাদুন আইসে, দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া শ্বেতকায়গণের বিলাস-কুঞ্জ মুসুরী ল্যাণ্ডোরের ভিতর দিয়া 'তিহরী' রাজ্যে উপস্থিত হয়; সেখান হইতে গঙ্গোত্রীর একই পথ। আমরা অপর পথে তিহরী গিয়াছিলাম; পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন বাস করায় আমাদের পথ ঘাট অনেকটা পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'তিহরী' হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। যখন লোটা কম্বল সম্বল করিয়া পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন যদি জানিতাম যে, হিমালয়ের কথা লিখিতে হইবে, তাহা হইলে সেই কম্বলের মধ্যে একখানি ট্রেলের ডায়েরি বাঁধিয়া লইতাম। ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাবে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্তের আরম্ভ এই তিহরী হইতে।

'তিহরী'র ভৌগলিক অবস্থানের একটা বিবরণ দিতে হইতেছে; সাধারণতঃ আমাদের স্কুলের ছাত্রেরা যে ভূগোল

পাঠ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে 'তিহরী' রাজ্যের নাম বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। গড়োয়াল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত; ব্রিটিশ গড়োয়াল ও স্বাধীন গড়োয়াল। স্বাধীন অর্থে নেপাল বা ভূটানের ন্যায় স্বাধীন নহে, ইংরাজের আশ্রয়াধীন রাজ্য—Protected State। পূর্ব্বে এই রাজাদের রাজধানী শ্রীনগরে ছিল, নেপালের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা পলায়ন করিয়া তিহরীতে আগমন করেন। নেপাল যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা গড়োয়ালের এক অংশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন; বর্ত্তমান শ্রীনগর তাহার রাজধানী। ইংরেজের আফিস আদালত সমস্ত সেখানে। গঙ্গা নদীর এক পারে ইংরেজের সীমানা, অপর পারে তিহরীর রাজার রাজ্য।

তিহরী রাজ্যের সবিশেষ ইতিহাস সংগ্রহ করা আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইলে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিতাম। এমন কি, সে সময়ে তিহরীর ইতিহাস জানিবার সামান্য আগ্রহও আমার মনে উদিত হয় নাই। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর রাজা রাজড়ার খবরের আবশ্যক কি, 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জানিয়া' কোনও লাভই নাই। তাই বলিয়া তিহরী রাজ্য সম্বন্ধে আমার যে কোন জ্ঞানই ছিল না, তাহা নহে; কোন বিশেষ কারণে তিহরী রাজ্যের অনেক সংবাদ আমাকে শুনিতে হইয়াছিল।

আমার এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তিহরী রাজ্যের একটি গোলযোগের সময়ে গোলযোগকারিগণের এক পক্ষের

মোক্তার ছিলেন। তাঁহার কল্যাণে আমি পূর্ব্বেই অনেক বিষয় জানিতাম। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, বা যাহার সহিত আমার কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, এমন গোলযোগের আমূল অনুসন্ধান করিয়া ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের দোষ-গুণের সমালোচনায় আমি পক্ষপাতী নহি। পরের দোষো-দ্ঘাটন পূর্ব্বক সেই কথা লইয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করা সময়ের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার বটে! পরনিন্দা পরচর্চ্চা না করিলে আমাদের অনেকেরই দিনটা বৃথা যায় বলিয়া মনে হয়; পরের ঘরের কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করি; কাহারও কোন গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইলে আমরা সহস্রচক্ষু হই; তিহরী-ব্যাপারে আমারও সেই প্রকার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার সেই সময়ের উদাসদৃষ্টির সমক্ষে কেহই বড় স্থান পাইতেন না; সুতরাং তিহরী রাজ্যের কথা সবিশেষ আমার স্মরণ নাই।

বর্ত্তমান রাজার স্বর্গীয় পিতা রাজা প্রতাপ সা, ১৯৪৩ সংবতে পরলোকগমন করেন। তিহরী রাজ্যের আয় অতি সামান্য, রাজ্যও ক্ষুদ্র। এখানে ইংরেজ রেসিডেণ্ট প্রভৃতির উৎপাত নাই। রাজা প্রতাপ সা অতিশয় ইংরেজ-প্রিয় ছিলেন, তাহার ফলে তিহরী সহরের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল। তিহরী সহরের অবস্থানভূমি অতি সুন্দর। যিনি প্রথমে এই স্থানে রাজধানীস্থাপনের সঙ্কল্প করেন, তিনি অন্য যাহাই হউন, কবি না হইয়া যান না। পর্ব্বতের মধ্যে এমন মনোরম স্থান আমি আর দেখি নাই, প্রকৃতি-দেবী

এই হিমালয়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সহরটিকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গানদী এই সহরের এক পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন, ভিলং নামে আর একটি নদী আসিয়া তিহরীর নীচেই গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উপরেই একটি ত্রিভুজের ন্যায় খানিকটা সমতল স্থান;—ত্রিভুজের দুই বাহু দুইটি তরঙ্গিণী; ত্রিভুজের ভূমি এক প্রকাণ্ডকায় দুরারোহ পর্ব্বত,—প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত পাষাণপ্রাচীর। সহর সুরক্ষিত করিবার জন্য কোন আয়োজনেরই আবশ্যকতা নাই; নদীদ্বয় এমনই খরস্রোতা যে, কাহারও সাধ্য নাই, নদী পার হয়। এই স্থানে রাজধানী। মহারাজ প্রতাপ সা গঙ্গানদীর উপরে একটা টানা সাঁকো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সাঁকো পার হইয়াই মসুরী যাইবার পথ। তিহরী প্রবেশের এইটিই প্রকাশ্য পথ; ইহা ব্যতীত আর একটি ক্ষুদ্র পথ আছে, তাহা দ্বারা বৎসরের সকল সময়েই তিহরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে। এই পথ শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া তিহরীতে আসিয়াছে। এ পথের মুখেও প্রকাণ্ড গেট ও শাস্ত্রীপাহারায় সুরক্ষিত। কিন্তু এ পথের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহ হয়, এখন সে পথে লোক চলিতেছে কি না। সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার উপরের সাঁকোর অংশবিশেষ টানিয়া তুলিয়া রাস্তাবন্ধ করা হয়, তখন আর কাহারও সহরে প্রবেশের পথ থাকে না।

রাজা প্রতাপ সা ইংরেজের অনুকরণে হাইকোর্ট স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী আইনের সহিত দেশীয় প্রথা পদ্ধতি

শিখাইয়া রাজ্যশাসনের সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা ভিলং নদীর অপর পারে একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে 'প্রতাপ নগর' নামে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কতক গুলি পাহাড়ীকে মুশৌরী প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া ইংরাজী ব্যাণ্ড শিখাইয়া লইয়া যান, আমি যখন তিহরী গিয়াছিলাম, তখন ইংরাজী ব্যাণ্ড শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

এই প্রকারে সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ প্রতাপ সা পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিনটি পুত্র তখন নাবালক। ইংরেজ গবর্মেণ্ট নাবালকের রাজ্য-রক্ষার জন্য প্রতিনিধি সভা (Council of Regency) গঠিত করেন, এবং মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (Regent) প্রতিনিধি বা সভার সভাপতি নিযুক্ত হন; তাঁহারই হস্তে ষ্টেট রক্ষার ভার প্রদত্ত হয়। এই রাজভ্রাতার নাম কুমার বিক্রম সা। সচরা-চর লোকে তাঁহাকে কুমার সাহেব বলিয়াই সম্বোধন করে।

সম্পত্তিভোগের কি মোহিনী শক্তি! যেখানে সম্পত্তি, যেখানে ক্ষমতা, সেইখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেইখানেই গোল-যোগ। সামান্য ভূমিখণ্ডে সহস্র সন্ন্যাসীর স্থান হয়, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে দুই জন রাজার স্থান কুলায় না। আমরা দরিদ্র,—সম্পত্তি, ধনগৌরবের মহিমা জানি না। এই দেখি, যেখানে অর্থ, সেখানেই অনর্থ; আর দেখি, যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই তাহার অপব্যবহার, সেখানেই প্রতিযোগিতা। বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্বরাজ্যে এই গোলযোগ আমরা

বাধাইয়া দিতেছি; রাজপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া নিরপেক্ষ বিচারকগণ প্রতিদিন আমাদের এই সমস্ত সম্পত্তি, ক্ষমতা, জোর জবরদস্তির মীমাংসা করিতেছেন; ধনীর বহু সঞ্চিত অর্থ পুলিশ, উকীল আর ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা ভাগ করিয়া লইতেছে; এ দৃশ্যের অভিনয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে। মামলা মোকদ্দমার দায়ে বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি পথের ভিখারী হইতেছে, তবুও কেহ সাবধান হয় না। তবুও যথাসর্ব্বস্ব উদ্ধারের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ, আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই।

কুমার সাহেব অভিভাবক হইয়া সমস্ত রাজ্য স্বহস্তে পাইলেন। তাঁহার পরামর্শদাতা হিতৈষী বন্ধু অনেক জুটিয়া গেল। তাঁহার অন্য অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি-বিষয়ে তিনি বড় ভাই অপেক্ষা অনেক হীন। পরামর্শদাতা-দের হস্তে কলের পুতুলের মত তিনি পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তাহার ফল এই হইল, রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিচারবিভ্রাট, বা বিচারবিক্রয়। অনেকে অভিভাবকের নাম লইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজ অন্তঃপুরে আর এক পক্ষ ধীরে ধীরে বল-সঞ্চয় করিতেছিলেন। মহারাজ প্রতাপ সাহের মৃত্যুর পর বিধবা রাণী সাহেবা অভিভাবকপদপ্রার্থিনী ছিলেন; কিন্তু ইংরেজ গবর্মেণ্ট মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রম সাকে অভিভাবক করাই কর্ত্তব্য স্থির করায়, বিধবা রাণী নিরস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষেও অনেকে ছিলেন; অভিভাবকসভার সভ্যগণের মধ্যে দুই

এক জন রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে রাণী সাহেবা প্রকাশ্যভাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে স্পষ্টভাবে কুমারসাহেবের শাসনের উপরে দোষারোপ করিলেন,—তিনি বিচার বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহার হস্তে রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

নাবালকের মাতার এই আবেদনপত্র ছোটলাট উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, উপেক্ষা করা কর্ত্তব্যবোধ করিলেন না। ১৯৪৮ সংবতে, কি তাহার কিছু পূর্ব্বে, বিভাগীয় কমিশনর শ্রীযুক্ত মেজর রস সাহেবের উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হইল; সেই সময়ে স্বর্গীয় বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য রাণীর পক্ষের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী রঘুনাথ বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিল। কুমার সাহেব অভিভাবকের পদ হইতে অপসারিত হইলেন, রাণী সাহেবা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গৃহবিবাদ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কুমার সাহেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। তিহরীরাজ্য হইতে তাঁহার চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হইল। অন্য উপায় না দেখিয়া কুমার সাহেব আর এক জন বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত গড়োয়ালের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে দুই পক্ষের উকীল দুই বাঙ্গালীর উর্ব্বরমস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে

লাগিল; পর্ব্বতবাসী গড়োয়ালীগণ মসী ও বাক্‌যুদ্ধ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। ছোটলাটের আসন টলিল, তিনি সমস্ত অনুসন্ধানের জন্য বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতবেষ্টিত তিহরী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কূটবুদ্ধিবলে উভয় পক্ষকেই পরাজিত করিলেন। কুমার সাহেব স্বপদে না হউক, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাবালক রাজকুমারের গদীপ্রাপ্তির আর অধিক দিন বিলম্ব নাই; এ সময়ে অন্য কোন পরিবর্ত্তন করিয়া লাভ নাই, ইত্যাদি বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, রাণী সাহেবাকেই অল্প দিনের জন্য অভিভাবক স্থির রাখিয়া, ছোটলাট নাইনিতালে প্রস্থান করিলেন। তিহরী রাজ্যের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল। রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি উভয় পক্ষের বিবাদে জলের মত খরচ হইয়া গেল।

এই সমস্ত ব্যাপারের অল্প দিন পরেই আমি তিহরী যাই। কুমার সাহেবের পক্ষীয় বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে; এ জন্য অনেকে আমাকে তিহরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হয় ত আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পারে। কেহ কেহ বলিলেন, আমি হয় ত সহরেই প্রবেশ করিতে পারিব না। কিন্তু আমার ন্যায় লোটা-কম্বলধারী ব্যক্তির মনে সে সব কথা জাগে নাই; আর রামের রাজ্য শ্যামের হস্তেই যাউক, আর হরির হস্তেই যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইবে, তাহা আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এই অবস্থায় এক দিন অপরাহ্নসময়ে আমি ও এক জন সন্ন্যাসী বন্ধু তিহরীতে প্রবেশ করি। স্বাধীন রাজ্যে এই আমাদের প্রথম পদার্পণ।

গঙ্গোত্রীর পথে তিহরী প্রধান সহর। এক দিন বৈশাখ মাসের সুন্দর অপরাহ্নে আমি প্রথম এই স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ করি। মুশৌরী হইতে তিহরী প্রবেশের যে পথ, আমরা সে পথ দিয়া আসি নাই; শ্রীনগরের পথে তিহরী প্রবেশ করিয়াছিলাম।

সহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একটি দ্রব্যে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে, কিন্তু আমার সঙ্গীর চক্ষে তাহার মূল্য অনেক। বহু দিন পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক পর্ব্বতগহ্বরে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কত নির্ঝরিণীর পূত শীতল বারি করপুটে পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়াছি। পাষাণহৃদয় হিমালয়ের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মহাপ্রেমের অনন্ত উৎস লোকলোচনের অদৃশ্য অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহারই দুই একটি সামান্য চিহ্ন এই সব নির্ঝর। আমরা অনেক নির্ঝরের জল পান করিয়াছি, কিন্তু এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে, পথিপার্শ্বে একটি নির্ঝরের যে জলপান করিয়াছিলাম, তাহা অমৃতধারা; এমন সুমিষ্ট জল আমি কখন পান করি নাই। তিহরী-রাজ সেই নির্ঝর বাঁধিয়া তাহার মুখের কাছে একটি গোমুখ, পাথরে ক্ষোদিত করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। সেই গোমুখ হইতে দিবসরজনী অজস্রধারে ভগবানের

করুণাধারা অবিশ্রান্ত পতিত হইতেছে। হিন্দুর রাজধানীর প্রবেশদ্বারে হিন্দুর পরমদেবতা দয়াবতী গাভীর মূর্ত্তি অকাতরে তৃষ্ণাতুর পথিককে জলদান করিতেছে। পতিতপাবনী গঙ্গার ধারা গোমুখের ভিতর দিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এখানে সেই গঙ্গোত্রীর পথে প্রথমেই আমরা তাহার একটা ছোটো খাটো নমুনা দেখিলাম।

সেই নির্ঝরের নিকট হইতে বাহির হইয়া ছোট একটি পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াই আমরা সম্মুখে একটি উদ্যানবেষ্টিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কখনও তিহরীরাজ্যে যাই নাই; সেই বৃহদায়তন অথচ সুদৃশ্য অট্টালিকা, তাহার চারি দিকে সুন্দর উদ্যান ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকা দেখিয়া, আমরা তাহাকেই রাজবাড়ী মনে করিয়াছিলাম। বাড়ীর বহিরংশ ইংরাজী ধরণে প্রস্তুত; বাগানও বোধ হয় কোন সাহেবের পছন্দমত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভিতর-বাড়ীর গঠন সেকেলে বড়মানুষের অন্তঃপুরের মত। আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বাড়ী দেখিতেছি ও তাহার সমালোচনা করিতেছি, এমন সময়ে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই আর এক জন পর্ব্বতবাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারও গন্তব্য স্থান তিহরী; সেখানে রাজদরবারে তাহার কি আবেদন আছে, সেই জন্ত সে দূর পর্ব্বতগৃহ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছে। সে বলিল, আমরা যে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, এটি বাগানবাড়ী; রাজকুমারেরা মধ্যে মধ্যে এখানে বেড়াইতে আসেন। সহর এখনও প্রায়

এক মাইল দূরে। আমরা আর কখনও তিহরী সহর দেখি নাই, শুনিয়া সে লোকটি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল, এবং সেখানে পৌছিয়া আমাদের সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে, এ ভরসাও যথেষ্ট দিল। বনে জঙ্গলে পর্ব্বতগুহায় কোনও গোল নাই, কোনও অসুবিধা নাই; প্রকৃতিমাতা তাঁহার সুবিশাল গৃহদ্বার সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, অসঙ্কোচে সেই মাতৃক্রোড়ে স্থান পায়; বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতগহ্বরে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করা যায়; ভগবানের করুণাধারায় তৃষ্ণা দূর হয়, প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রতিদিন কত ফল মূল সঞ্চিত হইতেছে, অনায়াসে গ্রহণ কর, কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু লোকালয়ে তাহা হইবার যো নাই, প্রতি পদে তোমাকে সাবধান হইতে হইবে; লোকালয়ে সব নিয়ম, সব আদবকায়দা, সামাজিক কৃত্রিমতা; তাহারই মধ্যে তোমাকে চলিতে হইবে, তাহার একটিকেও অবহেলা করিবার শক্তি তোমার নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। লোকালয়ে তুমি সামাজিক জীব, বনে জঙ্গলে তুমি মুক্তপক্ষ অসামাজিক জীব। তাই লোকালয়ে প্রবেশ করিতে সে সময়ে আমাদের মনে একটু সঙ্কোচ ভাবের উদয় হইয়াছিল। পথ ঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য, একটা বাসস্থান গোছাইয়া দিবার জন্য এক জন লোক পাইয়া, একটু ভাল বোধ হইল। রাজারাজড়ার দেশ, আর আমরা রুক্ষকেশ মলিনবসন লোটা-কম্বল-ধারী সন্ন্যাসী; রাজদ্বারে

যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আমাদের মনে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়।

আগন্তুক পথিকের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। দ্বিতল বাড়ী, নিম্নতলে হাইকোর্ট বসে, উপরে রাজকুমারেরা থাকেন। রাজকুমার তিনজনই আজমীর কলেজে পড়েন, গ্রীষ্মের অবকাশে এখন বাড়ীতে আছেন; শীঘ্রই কলেজ খুলিবে, এবং তাঁহারাও চলিয়া যাইবেন। কুমারেরা রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন না।

সন্ধ্যা প্রায় আগত দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটি স্থানে আমাদের সঙ্গী আমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটা ছোট গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি; সে আর ফিরিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখানে কোনও দোকানে বাসা মিলিবে না; মুসাফির লোকের বাসের জন্য রাজার নির্ম্মিত অনেকগুলি বাড়ী আছে, সেখানেই সকলকে থাকিতে হয়; থানাদারের নিকট যাইয়া বলিলেই, সে একটা বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

এইবার আমাদিগকে থানায় যাইতে হইবে। আমার সঙ্গী এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন অগ্রসর নন। বনে জঙ্গলে

ধর্ম্মোপদেশ দিতে তিনি খুব তৎপর, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় থাকিব, কি খাইব, এ সকলের বন্দোবস্ত করিতে তাঁর অনিচ্ছা। 'যাহা হয় হইবে,' এই তাঁর 'মটো'; কিন্তু আমি সে ভাবের হইলে হয় ত সে দিন রাস্তার ধারেই কতক রাত্রি পড়িয়া থাকিতে হইত; শেষে নগররক্ষকগণের রুলের গুঁতা বা সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া পলায়নের পথ পাইতাম না। যাহা হউক, সঙ্গীমহাশয়কে এক স্থানে বসাইয়া রাখিয়া আমি থানাদারের বাসায় গেলাম। দেখিলাম, আফিসেই তাঁহার বাসা। তিনি অন্তঃপুরে আছেন; কখন বাহিরে আসিবেন জিজ্ঞাসা করায়, "থোড়া সবুর করণে হো গা" জবাব পাইলাম। সবুরে মেওয়া ফলিবে কি না, বুঝিতে পারিলাম না, তবুও বসিয়া থাকিতে হইল। দীর্ঘ আধ ঘণ্টা অন্তঃপুরের পথ পানে চাহিয়াই কাটিয়া গেল; অবশেষে থানাদার মহাশয় দর্শন দিলেন। উচ্চ গদীর উপর তাকিয়া লইয়া যখন তিনি বেশ ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন, তখন আমিই সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া আমার আরজ নিবেদন করিলাম। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সঙ্গে কয় জন মানুষ, তাহা লিখিয়া লইয়া নিকটস্থ এক জন পেয়াদার উপরে আমাদের ভার দিলেন। আমি যখন বাহির হইয়া আসিব, তখন থানাদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় আদ্‌মিকা সিধা ভেজ্‌নে হোগা ?" থাকিবার স্থানেরই সুবিধা হইতেছিল না, এখন আবার সিধাও পাঠাইতে চায়। আমি ভদ্রভাবে সিধা গ্রহণ করিতে অস্বীকার

করিলাম। বাজার হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া খাইবার সঙ্গতি আমাদের আছে, তাহাও বলিলাম; এবং পয়সা দিয়া যদি থাকিবার স্থান মিলিত, তাহা হইলে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, এ কথাও জানাইয়া দিলাম। তিনিও একটু খাটো স্বরে বলিলেন যে, রাত্রিও হইয়াছে, এত রাত্রিতে রাজবাড়ী হইতে সিধা বাহির হইবে কি না সন্দেহ, সুতরাং আমরা বাজার হইতেই খাবার সংগ্রহ করিয়া লই। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমি বাহির হইলাম।

একখানি দ্বিতল টিনের ঘরের উপর আমাদের বাসা হইল। রাত্রের অন্ধকারে রাজপথের দিকের বারন্দায় আসিয়া আমরা বসিলাম; পেয়াদা চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, কোথায় কি আছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। পেয়াদা মহাশয় যে লণ্ঠনটি আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি লইয়া গেলেন। অনেক কষ্টে রাস্তা খুঁজিয়া নীচে নামিলাম। যে দোকানে খাবার কিনিতে যাই, সেই বলে, অপরিচিত বিদেশী লোককে সরকারের বিনা হুকুমে খাবার বেচিতে পারিব না। বিষম জ্বালা, আবার সরকারের হুকুম কোথায় আনিতে যাই? এমন সময়ে দেখি, আমাদের গৃহপ্রদর্শনকারী পেয়াদা মহাশয় সেই পথে যাইতেছেন। তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলায়, সে এক দোকানদারকে বলিয়া দিল। আমি সেখান হইতে খাবার কিনিয়া ঘরে ফিরিব, এমন সময়ে এক জন লোক সেখানে আসিয়া জুটিল, এবং আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া, কোথা হইতে আসিতেছি প্রভৃতি খবর

লইল। দেরাছনে থাকি, আমি বাঙ্গালী বাবু; এই কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপ মিয়াজিকো জান্‌তা?" কোন্ মিয়াজি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "দেরাছন্‌কা বাঙ্গালী বাবু কালীকান্ত সাহেব যো স্কুল বানায়া, উয়ো স্কুলমে মিয়াজি পড়্‌তা।" বুঝিলাম, মিয়াঝি অপর কেহ নহেন, বর্ত্তমান রাজকুমারের মাতুল 'মিয়াজিৎ সিং।' আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে, আমি তাঁহাকে জানি; কিন্তু তিনি যে আমার বিশেষ পরিচিত, আমার ছাত্র, তাহা আর ভাঙ্গিলাম না, বলিবার দরকারও ছিল না; চুপচাপ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা। কিন্তু তাহা হইল না। আমি বাসায় পৌঁছিয়া খাবার রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছি, এমন সময়ে সেই লোকটি আসিয়া আমাদের বাসার সন্ধান লইয়া গেল।

ক্ষুধার অত্যাচার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা দুই জনে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম। গল্পের প্রধান বিষয় তিহরীর ইতিহাস; আমি যাহা যাহা জানিতাম, সমস্ত বলিতে লাগিলাম, কথায় কথায় আহারে বিলম্ব হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটা, এমন সময়ে তিন চারি জন অশ্বারোহী ও মশাল হস্তে দুই তিন জন বরকন্দাজ আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল; মশালের আলোকে দেখিলাম, অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী 'মিয়া জিৎসিং।' ছাত্র হইলেও এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা আমার কর্ত্তব্য, মনে করিয়া, অন্ধকারে পথ অনুসন্ধান করিয়া নীচে যাইতে না যাইতেই তাঁহারা সবলে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে

সংবাদ না দিয়া আসিয়া এ ভাবে থাকা যে আমার পক্ষে নিতান্তই যুক্তিবহির্ভূত হইয়াছে, অন্য কথার পূর্ব্বে মিয়াজি তাহাই আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য, তাঁহার সে অনুযোগের কোনও জবাব আমার তহবিলে ছিল না; আমি সে কথা চাপা দিয়া অন্যান্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলাম; আগন্তুক অপরিচিত ভদ্রলোক কয়জনকে সাদর সম্ভাষণ করিলাম, এবং আমাদের জীর্ণ ছিন্ন কম্বলাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

তখনই চারি দিকে ধুম পড়িয়া গেল; থাকিবার জন্য ভিন্ন বাড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আমার সঙ্গী আর সে স্থান ত্যাগ করিয়া 'পাদমেকং' যাইতেও স্বীকৃত নন; কাজেই সেইখানেই আমাদের শয়নের জন্য চারপাই, বিছানা আসিয়া হাজির হইল। বাজার হইতে আহারের জন্য যে দ্রব্যগুলি আনিয়াছিলাম, চাকরদের পদতলে পড়িয়া তাহাদের মিষ্টান্ন-জীবন ধুলিকণায় পরিণত হইল!

এত রাত্রে সিধা আনিয়া রান্নাবান্না করিয়া আহার করিতে গেলে সমস্ত রাত্রিই সেই কার্য্যে অতিবাহিত হইবে ভাবিয়া রাজবাড়ী হইতে আর সিধা আসিল না। আজ সন্ন্যাসীর অদৃষ্টে রাজভোগ;—অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছি না,—সত্য সত্যই রাজভোগ। মনে পড়ে, কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন হিমালয়ের মধ্যে এক স্থানে দুইপ্রহরে রুটীর সঙ্গে বনের শাক ভাজা খাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম; সেই দিন আমার সঙ্গী পূজনীয় স্বামীজি বলিয়াছিলেন,

"আজ আমাদের রাজভোগ!" সেই শাকরুটী বা বনের ফল মূল বা অনেক দিন কেবলমাত্র ঝরণার জল খাইয়াই অতিবাহিত করিয়াছি।

প্রত্যূষে বন্দী ও স্তুতিপাঠকগণের গীতধ্বনি এবং নহবতের মনোহর ও শ্রুতিসুখকর প্রভাতী গানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যায় শয়ান অবস্থাতেই যথার্থ হিন্দুরাজ্যের প্রভাব বুঝিতে পারিলাম। সংস্কৃত পুস্তকাদিতে প্রভাতে স্তুতিপাঠকদিগের সুমধুর গীতধ্বনিতে রাজা মহারাজগণের নিদ্রাভঙ্গ হইত, পড়িয়াছিলাম; কিন্তু জিনিসটি কি, তাহা আজ বুঝিলাম। ও দিকে নহবতে সুন্দর তানলয়ে বিভাসটোড়ী আলাপ করিতেছে, এ দিকে তারস্বরে সুগায়কগণ প্রভাতপবন কম্পিত করিয়া গান করিতেছে! বৈশাখের প্রভাত যেন মহাসৌন্দর্য্যময় বোধ হইল। হিমালয়ের জনশূন্য ক্রোড়ে বৃক্ষতলে অনেক নিশা যাপিত হইয়াছে, প্রভাতে বিহঙ্গের বৈতালিক গানে বৃক্ষপত্রের মৃদুকম্পনে ও বৃক্ষচ্যুত পত্রস্পর্শে অনেক দিন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে এক প্রকারের আনন্দ, সে এক রকমেই সুখ; আর এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সুকোমল শয্যায় নিশাযাপন, প্রভাতে নহবতের বাদ্যে ও বৈতালিকের কণ্ঠধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ, এ আর এক রকমের আনন্দ। কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, আর কোন্‌টি অপকৃষ্ট, তাহার তুলনা আমি এত দিন পরে করিতে পারিতেছি না।

তিহরী রাজ্যের বর্ত্তমান ইতিহাস যাহা পাইয়াছি, তাহা সমস্তই লিখিয়াছি; পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যেরূপ উৎ-

সাহ থাকা আবশ্যক, যতখানি অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য, আমার আপাততঃ তাহা নাই। নেপাল ও গড়োয়াল রাজ্যের কোনও বিস্তৃত ইতিহাস আমি আজ পর্য্যন্তও পাঠ করিতে পাইলাম না। হুইলার সাহেব বা সেই রকমের দুই চারি জন দায়িত্ববোধশূন্য ইতিহাসলেখকের সংগৃহীত বা কল্পিত ইতিহাস পড়িয়া কতকগুলি ভ্রমাত্মক বিবরণ জানিয়া রাখা আমার ভাল বোধ হয় না। এই সমস্ত কারণে আমি তিহরীর পূর্ব্ব ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না।

তিহরী সহর দেখিলেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ গড়োয়াল রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান নগর শ্রীনগরের কথা আমার মনে পড়ে। অনেক দিন পূর্ব্বে এই শ্রীনগরসম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই স্থানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তিহরীর সঙ্গে শ্রীনগরের কি সম্বন্ধ, এবং তিহরীর এই সমস্ত সুরম্য রাজপ্রাসাদ দর্শন করিলে কেন শ্রীনগরের কথা মনে হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"অনেক দিন পূর্ব্বে একবার নেপালের রাজা গড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। গড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন; এই সময় হইতে গড়োয়াল নেপালের অধিকারভুক্ত হয়। গড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে গড়োয়াল স্বাধীন হইল। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গড়োয়ালের পরিবর্ত্তে ক্রীত হইয়াছিল। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ গড়োয়ালের অনেকখানি ইংরেজ গ্রহণ

করেন—এই অংশের নাম "বৃটীশ-গড়োয়াল" ; আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গড়োয়াল ; তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয়। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পরের হাত হইতে রাজ্য জয় করিয়া দিলেন—আবশ্যক হইলে যে তাঁহারা তাহা কাড়িয়া লইতেও পারেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা গড়োয়ালের তা যথেষ্ট আছে। আর স্বাধীন গড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে তাহাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নাই, যে জন্য এ দেশের দেশীয় পাগ্‌ড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতি ইংরেজের টুপি ও ছড়ি আমদানি হইতে পারে ; বরং প্রলোভনের যে টুকু ছিল সে টুকু আপদ অনেক আগেই মিটিয়া গিয়াছে ; নেপালের কবল হইতে গড়োয়াল উদ্ধার করিয়া ইংরেজ গড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশ টুকুই অধিকার করিয়াছেন—এই স্বাধীন গড়োয়ালই তিহরী রাজ্য।

"নেপালীরাজ গড়োয়াল আক্রমণ করার পর, গড়োয়াল-রাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, নেপালীরা অরক্ষিত প্রসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গড়োয়াল পুনর্বিজিত হইল তখন গড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন না ; তিনি শ্রীনগর হইতে ৩২ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম কোণে অলকনন্দার অপর পারে তিহরীতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেইখানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তিহরী রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি জানি না।"

আজ তিহরীতে অবস্থান; সঙ্গী তাহাতে প্রথমে সম্মত ছিলেন না; তিনি এখন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলই বেশী ভাল বাসেন। আমিও যদি তাঁরই মতে মত দিয়া বলি, বন জঙ্গল লোকালয় অপেক্ষা ভাল, তবে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা বলা হয়। হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্য অবশ্যই ভালবাসি; যখন পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের চিরতুষার-রাশির উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করে তখন হৃদয় সে দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু আর সে দিক হইতে ফিরিতে চাহে না, কিন্তু তাহারই পাশে পাশে হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে আমার সেই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্রতম বাসভবনের একটা স্নিগ্ধ শ্যামছায়ার সুশীতল দৃশ্য আমাকে যে অন্তদিকে ফিরাইয়া লয় সে কথা অস্বীকার করি কি করিয়া। এই জীর্ণ কম্বলের মধ্য হইতে যে একটা মমতার গন্ধ ছুটিয়া বাহির হয় তাহা ঢাকি কি দিয়া? লোকালয়ের উপরে যে একটা আজন্ম টান তাহা যে আমরণের সঙ্গী, সে কথা গোপন করিবার উপায় কি? তাই লোকালয় দেখিলেই সেখানে দুই দিন বাস করিতে ইচ্ছা করে; ক্ষুদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীর পবিত্র দৃশ্য অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ অবস্থায় তিহরীতে এক দিন বাসের ইচ্ছা হইবে,তাহাতে আর বিচিত্র কি। আমার আগ্রহাতিশয়-দর্শনে স্বামীজিও তাহাতেই মত দিলেন; তবে তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন সহরের মধ্যে তিনি বাহির হইবেন না, সমস্ত দিনটা এই ঘরের মধ্যেই কাটাইবেন। তিনি তাঁর সেই

ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে চাপিয়া বসিলেন, আমি সহর দর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম।

পূর্ব্বদিন এখানে আসিবার সময়েই সহরের সমস্তটা এক রকম দেখা হইয়াছিল; তবুও আজ আবার বাহির হইলাম। প্রথমেই রাজবাড়ীর দিকে গেলাম। সহরের মধ্যে একটা উচ্চস্থানে রাজবাড়ী; সিপাহী সান্ত্রী অনেক দেখিলাম, পাছে অধিক অগ্রসর হইলে দুই চারিটি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ভয়ে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রাজবাড়ী দেখিতে লাগিলাম। রাজার বাড়ী বলিলে সহজেই মনে যে একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়, তাহার কিছুই এ বাড়ীতে নাই; এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসগৃহ শ্রীনগরের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের কথা মনে হইল। কিছু দিন পূর্ব্বেই শ্রীনগরে গিয়াছিলাম; যাহা দেখিয়াছিলাম, সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার! রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়িয়া আছে—দুই চারি বৎসর পরে কোন পর্য্যটক সেখানে গেলে ঐ স্তূপাকার ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবালসজ্জিত দেখিয়া একটা ছোট রকমের গিরিশৃঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেওয়ালগুলি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার বহুকাল হইতে একই অবস্থায় ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর যাঁদের জন্য তাহারা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ এই গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া দিন কাটাইতেছেন; একবারও হয় ত সে

দুঃখের কথা, সেই পরিত্যক্ত রাজ-অট্টালিকার কথা তাঁদের মনে হয় না। কিন্তু কত পরিব্রাজক, কত সন্ন্যাসী, সেই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, এবং কল্পনানেত্রে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের একটা

'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা———'

দৃশ্য দেখিতে থাকে। এই তিহরী রাজভবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্য সত্যই এই রাজবংশের অতীত গৌরবের দৃশ্যে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

অপর দিকে কুমার সাহেবের বাড়ী। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা কেহ কেহ বলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এত দিন বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেজাজটা কেমন বদ্ হইয়া গিয়াছিল; রাজারাজড়ার দিকে যাইতে কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব মনে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাই সে দিকে গেলাম না। এক বার মনে হইল, এই দূর পর্ব্বতের মধ্যে আমার স্বদেশবাসী এক জন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি; কিন্তু কেমন বাধ বাধ বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গঙ্গা; গঙ্গার ধারে গিয়া বসিলাম। আমাদের দেশে যেমন গঙ্গায় স্নানের ঘটা, শত শত নরনারী কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গার স্তব গান করিতেছে, এখানে সে দৃশ্য দেখিবার যো নাই। শীতপ্রধান দেশের লোক স্নানকার্য্যটি সংক্ষেপেই শেষ

করে; কেহ বা মাসান্তে, কেহ বা দুই দশ দিন অন্তে স্নান করে। স্নানের ঘাটের উপরেই একটা দেবালয়; আমি সেই দেবালয়ের সিঁড়িতেই বসিয়াছিলাম। বিদেশী লোক একাকী বসিয়া আছে দেখিয়া মন্দিরের পূজকমহাশয় আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং নানাপ্রকার কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাড়ী সহর হইতে অনেক দূরে; আজ ১৫ বৎসর এই মন্দিরের পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী আছেন। স্বর্গীয় মহারাজ প্রতাপ সা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহারই আগ্রহে পুরোহিত মহাশয় তাঁহার নির্জ্জন শৈলকুটীর ও তিন বিঘা জমি ছোট ভাইয়ের হস্তে দিয়া এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু সে কাল আর নাই। বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সো দিন চলা গেয়া!" সেকালের জন্য এই প্রকার আক্ষেপ, কাতরোক্তি, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শুনি। তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে অনেকেই সেকালের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা, যাহা কিছু সেকেলে, যাহা কিছু পুরাতন, সে সকলকেই কেমন একটা অতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। যাহা চলিয়া গিয়াছে, যাহা আর ফিরিবে না, তাহার উপর বোধ হয় মানুষের মমতা হয়, এবং তাহারই জন্য সেগুলিকে অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অতীত কার্য্যের স্মৃতি থাকে, কৃত-কর্ম্মের সাফল্যমাত্র নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়, তবে ঝঞ্ঝাট-গুলি ত আর থাকে না; তাই সে এত মনোরম, তাই বর্ত্ত-

মানের সহস্র সুবিধার উপরেও তাহার উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরোহিত মহাশয় সে কালের অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন; তখন পর্ব্বতে সোনা ফলিত, তখন গাভীগণ অকাতরে দুগ্ধদান করিত, মেঘ বারি বর্ষণ করিত; এই কলিযুগের শেষভাগে দেবগণ নিদ্রিত, পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, দেশের ঘোর দুর্দ্দশা। বিনা বাদ প্রতিবাদে এই সব কথা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কাজেই ইহার মধ্যে আর নূতনত্ব কিছুই দেখিলাম না। স্বাধীনরাজ্য, বাতাসেও সংবাদ বহন করে, এই ভয়েই হয় ত পুরোহিত একটি কথা গোপন করিলেন; নতুবা তিনি যদি বলিতেন যে, স্বর্গীয় রাজা প্রতাপ সার মত রাজা আর নাই, তাঁর সময়ের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময় হীনপ্রভ হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই সে কথার প্রতিবাদ ছিল না। বিদেশী লোকের সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে এ সব কথা বলা ভাল নহে, তাই পুরোহিত মহাশয় অন্য কথা পাড়িলেন। পুরোহিত পণ্ডিতব্রাহ্মণ, দুই চারিটি শাস্ত্রকথা, দশটি অনুষ্টুপচ্ছন্দের সংস্কৃত শ্লোক না আওড়াইলে তাঁর প্রতিপত্তি থাকে কৈ? তাই তিনি শাস্ত্রালোচনার ভূমিকা আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রালোচনা বেশ কথা, কিন্তু তারও সময় অসময় আছে। শনিবারের দিন দেড়টার সময়ে আফিস বন্ধ হইলে কেরাণীগণ যখন উর্দ্ধমুখে ছোটে, তখন দুই পয়সা দিয়া প্রকাণ্ড একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া তাহার মধ্যের পাঁচ কলম বোঝাই

অনিত্যতার বক্তৃতাপাঠ যেমন অসাময়িক, এই বেলা প্রায় দশটার সময়ে অস্নানে, অনাহারে শাস্ত্রগ্রন্থ খুলিয়া বসাও তেমনি সময়োপযোগী নহে। সুতরাং দুই এক কথায় পুরোহিত মহাশকে নিরুত্তর করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি, প্রকাণ্ড একটা সিধা আসিয়াছে। দ্রব্য নানাপ্রকার, এবং তাহার পরিমাণও বেশী; আমরা দুইটি মানুষে এক মাসেও তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারি না। বুঝিলাম, এ প্রকাণ্ড সিধা রাজগৌরবপ্রকাশের জন্য, নতুবা আমাদের মত দুইটি মানুষের দুই বেলার আহারের জন্য এত জিনিসের দরকার হয় না।

তিহরীতে সদাব্রত নাই; সাধু সন্ন্যাসী অতিথি সকলেই প্রতি দিন অপরাহ্নে রাজবাড়ীতে সিধা পায়, এবং সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু গাঁজার পয়সাও পায়। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে; তবে শুনিলাম, পূর্ব্বে অতিথিসেবার যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, এখন তাহা নাই। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীতে এ প্রকার হওয়াই সম্ভব; কুমারগণ যখন রাজ্য নিজ হস্তে পাইবেন, তখন আবার সমস্তই পূর্ব্ববৎ হইবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সে দিন শুনিলাম, বর্ত্তমান রাজপুত্রগণ পিতার ন্যায়ই দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ।

অপরাহ্নে আবার বাহির হইব, এমন সময়ে হাইকোর্টের বাড়ীর নিকট বিগল্ বাজিয়া উঠিল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য, সদর দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, এক জন অশ্বারোহী বিগল্ বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে আসি-

তেছে, তাহার পশ্চাতে আরও দুই জন অশ্বারোহী; অস্ত-গামী সূর্য্যকিরণে তাহাদের সুবর্ণখচিত উষ্ণীষ শোভা পাই-তেছে; তাহার পশ্চাতে একখানি জুড়িগাড়ী, শেষে আরও কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক। শুনিলাম, প্রতি দিন অপরাহ্নে রাজকুমারগণ মাতৃচরণে প্রণাম করিতে আগমন করেন, এবং এক ঘণ্টা থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান। রাজ-কুমারেরা আসিতেছেন' শুনিয়া, বাজারের লোক সমস্তই রাজপথে কাতার দিয়া দাঁড়াইল, এবং রাজার গাড়ী যখন সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তখন সকলেই "জয় জয়, মহারাজা" বলিয়া নতশিরে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাই এখানকার প্রথা। এ দৃশ্য আমার অতি সুন্দর বোধ হইল। আমিও যথারীতি অভিবাদন করিলাম।

রাজকুমারগণ চলিয়া গেলে, আমি তিহরী জেল দেখিতে গেলাম। এখানকার জেলের বন্দিগণ যথেচ্ছ বাহিরে বেড়া-ইতে পারে, তবে ভয়ানক অপরাধিগণের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা। এই জেলের মধ্যে নরহত্যাকারী নাথু উইল্‌সনকে দেখিলাম। এই ভদ্রলোকের পরিচয় আবশ্যক। আমার মনে পড়ে, কিছু দিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মিরারের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই নাথু উইলসন সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন; সে প্রবন্ধের কোনও কথাই আমার মনে নাই।

পর্ব্বতের মধ্যে দেরাদুন, মসুরী প্রভৃতি সহর বলিলে, উইলসন নামে এক জন সাহেব কেরাচুন বাস করেন। তিনি প্রথমে কাঠের কারবার আরম্ভ করেন, শেষে শিকারী

রাখিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অগাধ ধন সঞ্চয় করেন, এবং সেই জন্যই ঐ দেশে Wilson money একটা প্রবাদবচন হইয়া গিয়াছে। এই উইল্‌সন সাহেব একটি পাহাড়ী রমণীকে বিবাহ করেন; সেই রমণীর গর্ভে দুইটি পুত্র হয়; এক জনের নাম John কি Henry Wilson, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাথু উইলসন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেহারাও সাহেবের মত, এবং চালচলনও তাই। তিনি বিবি বিবাহ করিয়া দেরাদুনে পৃথক বাড়ীতে বাস করেন। নাথু উইল্‌সন অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন; অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু টাকার জোরেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, মুক্তি পান। অবশেষে কয়েকটি খুন করার অভিযোগে তিহরীতে অভিযুক্ত হন। অনেক চেষ্টা ও অনেক অর্থব্যয়ে প্রাণদণ্ড হয় না, দশ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। লোকটা ১২।১৩ জন লোককে হত্যা করিয়াও অনায়াসে অব্যাহতি পাইল। যে দিন তিহরীর কারাগারে তাহাকে দেখি, সত্য সত্যই আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সে দিন পশ্চিমদেশবাসী একজন বন্ধুর নিকটে শুনিলাম, নাথু উইলসন কারামুক্ত হইয়া দেরাদুনে আসিয়াছেন; তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন বিষয়ের উত্তরাধিকার লইয়া দুই ভ্রাতায় মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছেন।

রাত্রে জিতসিং মিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি রাজসরকার হইতে এক পরওয়ানা বাহির করিয়া আনিয়া-

ছেন, এবং এক জন পিয়াদা নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পেয়াদা পরওয়ানা লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তিহরী-রাজ্যের মধ্যে আমরা যত দিন থাকিব, সেই পেয়াদা আমাদের সঙ্গে থাকিবে, এবং আমরা যে বেলা যেখানে থাকিব, সেই স্থানের লম্বরদার (আমাদের দেশের তহসিল-দার) আমাদের খানাপিনার সরবরাহ করিবে। আমরা কিছুতেই সম্মত হইব না, মিয়াজি কিছুতেই ছাড়িবেন না। তাঁহার স্নেহের আবদার ছাড়াইতে পারিলাম না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা ষোড়শোপচারে আহারাদি করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে নহবতের সুন্দর টোড়ী আলাপে জাগ্রত হইয়া হিন্দু রাজার রাজধানী ত্যাগ করিলাম।

অতিপ্রকৃত কথা।

কেহ পর্য্যটনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হয়, কেহ জ্ঞান-লাভের উদ্দেশে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে। কিন্তু পৃথিবীর সকলে সমান নয়; এমনও দেখা গিয়াছে, কেহ কেহ তন্দ্ৰবিল তছরুপাত করিয়া, কেহ বা নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ সকল ভিন্ন এমনও দুই এক জন হতভাগ্য লোকের অভাব নাই, যাহারা শ্মশানক্ষেত্রে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, উদাসহৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে, লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর ন্যায়, এক অনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই রমণীয় নেপথ্য তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন, কুসুমসুরভিপরিব্যাপ্ত, সুমধুর সমীরণহিল্লোলিত এবং বিহঙ্গকলকাকলীমুখরিত বাহ্যপ্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সজ্জিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় সে সৌন্দর্য্য-গ্রহণের অধিকারী নহে, সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া আসিলেও তাহার মুখ হইতে তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। উত্তর-ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি,

অনেকেই তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু সেই সমস্ত মহান্ সুন্দর দৃশ্য, প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্ত সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে পাই নাই; কিন্তু তথাপি দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। জীবনে কখনও কবিতার সেবা করি নাই, প্রভাত-বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা কখনও আমাকে ব্যাকুল করে নাই; বজ্রকঠোর হৃদয় লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ এক দিন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ায় যে দিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে চলিলাম। ইহাই আমার ভ্রমণের ইতিহাস। ইহাতে এমন কিছু নাই, যাহাতে অপরের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে; কিন্তু হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন দুই একটি ব্যাপার আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, যাহা আমার নিকট নিতান্ত দৈবঘটনা ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে "অতিপ্রকৃতে" বিশ্বাস করিলে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। যাহা হউক, আজ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; ইহা বৈজ্ঞানিক পাঠকের মনে যে সিদ্ধান্তই উপস্থিত করুক, অনেকের নিকট ইহা রহস্যাবৃত একটি জটিল তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হইবে না। আমি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারি নাই।

একবার আমি গাড়োয়ালরাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর হইতে তিহরী হইয়া গঙ্গোত্রীর পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমরা যে পর্ব্বতের মধ্যে যাইতেছিলাম, তাহা ইংরেজসীমার

বাহিরে অবস্থিত; তিহরী রাজার রাজ্য, অর্দ্ধস্বাধীন হিন্দু-রাজ্য। পর্ব্বতের মধ্যে পথের অবস্থা বড় ভাল নহে, বিশেষ আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, সে পথ অত্যন্ত দুরারোহ এবং সঙ্কটপূর্ণ বলিয়া তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্য পথিকগণ সাধারণতঃ এ পথে ভ্রমণ করে না; কেবল কষ্টসহ সাধু সন্ন্যাসীর দল পথ সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য এই পথে গমন করেন। লোকযাতায়াতের অল্পতাহেতু অনেক অনিমন্ত্রিত কণ্টকলতা রাস্তায় অনধিকারপ্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূতভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং পরিব্রাজকবর্গের কঠিন পাদচর্ম্মের সহিত কোমলসম্বন্ধস্থাপনের জন্য উদগ্রীব রহিয়াছে। আমরা অবিশ্রান্ত সেই তীক্ষ্ণ কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে করিতে চলিলাম; পদাহত হইয়া শুধু যে তাহারাই ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহা নহে, তাহাদের প্রজাবৃন্দও নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাকুলের তাড়নায় আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম। ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া যখন তাহারা বিপক্ষকে আক্রমণ করে, তখন বড় বড় বীরপুরুষকেও আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে করিতে বেলা প্রায় ১১ টার সময় এক সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলাম। চলিতে আরম্ভ করিয়া লোকালয়ের চিহ্নমাত্র পাই নাই; এমন কি, কোনও দিকে সামান্য পর্ণ-কুটীর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল

প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষশ্রেণী, শাখাপল্লব বিস্তারপূর্ব্বক সেই নির্জ্জন প্রদেশের নীরবতা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া, কত কাল হইতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যোগনিমগ্ন যোগীর ন্যায় কত কাল হইতে তাহারা সমাধিমগ্ন! নিম্নে পাষাণস্তূপ কোমল লতাপল্লবে সমাচ্ছন্ন, এবং চতুর্দ্দিকে নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণীর অবিরাম ঝর্‌ঝর্ শব্দ! এখানে লোকালয় নাই, পার্ব্বত্য অসভ্যগণও এত দূরে আসিয়া বাস করিতে চাহে না। যদি সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পর্ব্বতের অনুর্ব্বর গাত্রে, কিম্বা বায়ুতাড়িত শরশরকম্পিত বৃক্ষপত্রে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া রাখিলে ক্ষুধার লাঘব হইত, তাহা হইলে এই স্থানে লোকে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত, কিন্তু এখানে জীবনসংগ্রামোপযোগী কিছু আয়োজন না থাকায়, লোকের বসবাসের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই বিজনপ্রদেশের গভীর অরণ্যে যদি কাহারও বাসের আবশ্যক কিম্বা ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে 'অতিমানুষ' বা 'অমানুষ' বলা যাইতে পারে। হয় সে মানুষের ভয়ে এরূপ স্থলে লুক্কায়িত থাকে, না হয় সে মনুষ্যসমাজ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া, এইরূপ নির্জ্জনপ্রদেশই আপনার সাধনার উদযাপনক্ষেত্রে পরিণত করে।

উপরে যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, তিনি যে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। কথোপকথনে জানিতে পারিলাম, তিনি পরম জ্ঞানী; তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা

বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার আশ্রমের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আশ্রমের কথা শুনিলে দুইটি বিভিন্ন চিত্র মনে উদিত হইয়া থাকে। একটি চিত্র আর্য্যঋষিগণের অনুপম, উজ্জ্বল, পবিত্রতাপূর্ণ, পরমশান্তিরসাস্পদ পুণ্যতপোবনের,— যাহার অমর মহিমা কীর্ত্তন করিতে কালিদাসের সকল প্রতিভা ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং যাহার মাধুর্য্য এই জন-কোলাহলসংক্ষুব্ধ রৌদ্রোত্তপ্ত ধূলিময় সংগ্রামক্ষেত্রেও কোনও যুগান্তর হইতে স্মৃতির সুমন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া তাপক্লিষ্ট-হৃদয়ে বিপুল আনন্দ প্রদান করিতেছে। আর একটি চিত্র,— স্থূলোদর, মুক্তকচ্ছ, শিখাকৌপীনসমন্বিত বৈরাগীবৃন্দের বৈষ্ণবীপরিবেষ্টিত আখড়ার। কিন্তু এই সন্ন্যাসীর 'আশ্রম' এই উভয় প্রকার আশ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন বলিয়াই ইহাকে আশ্রম বলিলাম, নতুবা ইহা এক খানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কুটীরের কিছুমাত্র পরিপাট্য নাই, সপ্তাহের মধ্যে এক দিনও কুটীর প্রাঙ্গণস্থ স্তূপাকার বৃক্ষপত্রগুলি অপসারিত হয় কি না সন্দেহ, হইলেও দুই দিনের মধ্যেই প্রাঙ্গণ আবার পূর্ণ হইয়া যায়। কুটীরের বাহিরের অবস্থা এইরূপ, ভিতরের অবস্থা ততোধিক সুন্দর। হয় ত সন্ন্যাসীঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে কুটীরে অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, এখনও অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ও শুষ্ক পত্র কুটী-রের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে; আবার কোনও দিন অগ্নি জ্বালি-বার প্রয়োজন হইলে সেগুলি কাজে লাগিতে পারে। গৃহের

সাজসজ্জার মধ্যে একখানি জীর্ণ চর্ম্ম ;—কিন্তু তাহা কোনও ব্যাঘ্রের দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, অথবা কোনও দুর্ব্বলহৃদয় মৃগের দেহাবরণ ছিল, আমি ত দূরের কথা, প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও তাহার নিরূপণ করিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চর্ম্মখানি যে কত কালের পুরাতন, তাহাও স্থির করা দুরূহ ; ক্রমাগত ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্লোম হইয়া গিয়াছে। এই আসনে সন্ন্যাসীর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ ইহা শত শত ছিদ্রে পরিশোভিত, এবং ইহার যে অংশে ছিদ্রসংখ্যা কিছু কম ছিল, তাহা মৃত্তিকানুলিপ্ত ; কিন্তু তথাপি সন্ন্যাসী ঠাকুর এই আসনের মায়া কাটাইতে পারেন নাই ; সংসারে এরূপ মায়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শুনিয়াছি, শুকদেব গোস্বামীও একবার তাঁহার অদ্বিতীয় সম্বল কৌপীনখানিকে অগ্নিমুখে পতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই নিভৃত পত্রকুটীরে জীর্ণ আসনে উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসী কাম্যফললাভের আশায়,—চিরবাঞ্ছিতের উদ্বোধনে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছেন ; শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, উৎসাহের অভাব নাই। প্রাবৃটের প্রচণ্ড বর্ষণ, ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ইনি নিবিষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন ; দেখিয়া, মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমরা বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিয়া অনেক সময় মনে করি—পারত্রিক ফললাভের জন্য দেহের নির্য্যাতন মূঢ়তা-

মাত্র; এ কথা কতদূর যুক্তিযুক্ত, বলা যায় না; কিন্তু কঠোরতা ভিন্ন কোনও কালে কোনও দেশে সিদ্ধিলাভ হয় নাই, এ কালেও হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কঠোরতা বা ত্যাগ-স্বীকার আবশ্যক। এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার একবারও মনে হয় নাই যে, নিদারুণ কঠোরতায় তাঁহার দেহ ভগ্ন, মন অপ্রসন্ন বা আনন্দশূন্য হইয়াছে, হয় ত তিনি সচ্চিদানন্দের চিরপ্রসন্নভাব বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাই তাঁহার এত আনন্দ।

কুটীরে কয়েকখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। পুঁথিগুলি মৃত্তিকায় পরিণত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু সে জন্য সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎমাত্রও উদ্বেগের লক্ষণ দেখা গেল না। পুঁথিগুলি পড়িবারও কোনও উপায় দেখিলাম না; অক্ষরগুলি অনেক দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাসীর কুটীরে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন কি, একটি লোটা কি কমণ্ডলু পর্য্যন্তও নাই।

কুটীরের পার্শ্বেই একটি ঝরণা; অবিশ্রাম ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে। এই শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষপত্রের শর্শর্ কম্পন, আর চতুর্দ্দিকের মহান্ গম্ভীর দৃশ্য আমার চঞ্চল হৃদয়েও এক অভিনব স্বর্গের সুরম্য কল্পনা জাগ্রত করিল। হায়, পার্থিব সুখ ও শান্তি, উপভোগ ও বিরাম কি আবিলতাপূর্ণ! কিন্তু তাহাতেই আমরা মুগ্ধ। এই নির্ঝরিণীর কল-তানের সহিত হৃদয় মিশাইয়া—তদ্গতচিত্তে যখন সন্ন্যাসী

অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে মগ্ন হন, তখন তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ উপকূল এক অনাবিল আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহা অনুভব করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত।

কুটীরের প্রতি সন্ন্যাসীর যত্নের অভাব হইলেও দেখিলাম—এই নির্ঝরিণীর প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ। কুটীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর তিনি আমাদিগকে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ঝরণার কাছে যাইবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলাম; বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিয়া শরীর যেরূপ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। সন্ন্যাসীর অনুমতিমাত্রেই আমি ও আমার সহচর সন্ন্যাসী নির্ঝরের ধারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সজ্জিত করিয়া আবক্ষ-উচ্চ চক্রকার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বেদীতে উঠিবার জন্য আল্‌গা পাথর স্তূপাকারে রাখিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত কথা হইয়াছে। তাহার পরই ঝরণার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সুদৃশ্য ঘাট, কিন্তু এ সমস্তই আল্‌গা পাথর, সুন্দররূপে বিন্যস্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই ঘাটের শোভা অতি রমণীয়; যেখানে যে পাথর স্থাপন করিলে শোভা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ করিয়া সন্ন্যাসী ঘাট সাজাইয়াছেন। কোনও স্থানে কাল পাথর,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আবলুস বিনিন্দিত; কোথাও তুষার-ধবল শ্বেতপ্রস্তর; কোথাও অত্যুজ্জ্বল লোহিতপ্রস্তর। এইরূপ নানা আকার ও নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা এমন সুন্দর

লতা পাতা ও ফুল অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, দেখিলে কখনই মনে হয় না,—এই সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ জীবন কেবলমাত্র তপশ্চর্য্যাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাজমহলের মধ্যে বহু-মূল্য প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যে সমস্ত লতা ও পুষ্প অঙ্কিত আছে, সন্ন্যাসী এই নির্জ্জন পর্ব্বতের একটি রমণীয় উপত্যকায় তাহারই অনুকরণে এ সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। নির্ঝরিণীর অতি নিকটে একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষ; তাহার তলদেশ প্রস্তরবদ্ধ। এই বৃক্ষের ত্বক্ অত্যন্ত মলিন, সন্ন্যাসী বহু দিন ধরিয়া বোধ হয় এই বৃক্ষে হেলান দিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। ঘাটের নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল;—সন্ন্যাসীর তপোবলে কি হস্তকৌশলে, কি উপায়ে জানি না,—বৃক্ষগুলি এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সমস্ত দেখিয়া বুঝিলাম, সন্ন্যাসী এই রমণীয় নির্ঝরিণীর তীর, দীর্ঘপত্রপরি-শোভিত সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতল, আর স্বহস্ত-রচিত রম্য প্রস্তরবেদীকেই আপনার বাসস্থানে পরিণত করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার বিরাম-কুঞ্জ; কুটীর উপলক্ষমাত্র।

বৈশাখ মাসের দিন, মধ্যাহ্ন কাল; রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। রাত্রে অত্যন্ত শীত পড়ে বটে, কিন্তু দিবসের সমুজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে পর্ব্বত ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়াছে। আমি এখনও কম্বল-ধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া উঠিতে পারি নাই, অতএব গাত্রবস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী তাঁহার স্বশ্রেণীতে এক জন প্রধান ব্যক্তি, অতএব

তিনি স্নান করা বাহুল্য বোধ করিলেন। এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে এক দিনও স্নান করিতে দেখি নাই; সুতরাং এই অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আর তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম না।

সন্ন্যাসী কোন্ সময় বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই; অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাকে সেই সুশীতল নির্ঝরিণীপ্রবাহে স্নান করিতে দেখিয়া পলিতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু, অশীতপর বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া স্নেহগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এত্না ঘড়ি ঠাণ্ডা পানিমে মৎ রহে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু উঠিতে উঠিতেও অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া মাথায় দিতে লাগিলাম। মনে হইল, সেই নির্ম্মল পূত নির্ঝরিণীসলিলে আজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ধৌত হইয়া গেল; হায়, হৃদয়ের তাপও যদি এমনি করিয়া ধুইয়া যাইত!

আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর ইতিমধ্যেই বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে; উভয়ের বয়ঃক্রম প্রায় সমান, এবং যোগমার্গেও হয় ত উভয়েই সমান অগ্রসর হইয়াছেন। সঙ্গী সন্ন্যাসীকে আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম; দরিদ্র যেমন পথিমধ্যে রত্ন কুড়াইয়া পায়, আমি সেইরূপ অগণ্য সাধারণ সন্ন্যাসীর জনতার মধ্য হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। কিন্তু দরিদ্র রত্নের আদর জানে না, অকিঞ্চিৎকর প্রস্তর ভাবিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করে,

আমিও আমার এই সঙ্গী সন্ন্যাসীকে অধিক দিন বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। যদি তাঁহার সঙ্গী হইবার উপযুক্ত হইতাম, তাহা হইলে হয় ত পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ এবং নিরাশা ও আশায় সদা-উদ্বেলিত দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এই দুঃখশোকময় সংসারের ভগ্ন নাট্যশালার শুষ্ক কুসুমদাম ও নির্ব্বাণপ্রায় দীপালোকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত যবনিকা পুনরুত্তোলন পূর্ব্বক অভিনয়কার্য্য আরম্ভ করিতে হইত না।

উপরে উঠিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর সমীপস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার নিকটে কয়েকটি মূল রহিয়াছে; দেখিতে প্রায় মানকচুর মত, কিন্তু তত মোটা নহে; অনুমান করিলাম, আমি স্নান করিতে নামিলে অতিথিসৎকারের জন্য সন্ন্যাসী অরণ্য হইতে এই কচু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। যাহা হউক, অতিথিসৎকারকার্য্য কিরূপ সম্পন্ন হইবে, ক্ষুধার আধিক্যবশতঃ যখন আমি মনে মনে সেই কথার আন্দোলন করিতেছিলাম, সেই সময়ে সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাচ্চা, তুম্‌হারা খানে কি ওয়াস্তে ইয়ে মূল লায়া।" এই ভীষণদর্শন কচু কিরূপে খাইব, এই চিন্তাতেই আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। বহুদূর পর্য্যটন ও পরিপাকশক্তির বাহুল্যবশতঃ ক্ষুধার অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু সেই দারুণ ক্ষুধানলের যে ইন্ধন সংগ্রহ হইল, তাহা অত্যন্ত অসাধারণ। বুঝিলাম, "যেমন বাঘা ওল, তেমনই বুনো তেঁতুল"—এই বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রবচন সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা যায় না। আমি নির্ব্বাক হইয়া সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম।

নিকটে যে সকল শুষ্ক কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া তিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং সেই অগ্নিতে তাঁহার সংগৃহীত উক্ত কচুজাতীয় উদ্ভিদমূল নিক্ষেপ করিলেন; বুঝিলাম, ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া পড়িল। দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট বহু দিন পূর্ব্বে যে নিরাকার আহারের ব্যবস্থা পাওয়া গিয়াছিল, এতদিন পরে এই বিদেশে সন্ন্যাসীর কৃপায় তাহা সাকার দেহ ধারণপূর্ব্বক আমার দগ্ধোদরপরিতৃপ্তির উপায় হইয়া দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত অনেক দুরারোহ, বিপদসঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, আহার্য্য-সামগ্রীর অভাবে ক্রমাগত দুই তিন দিন সামান্য বিল্বপত্রমাত্র চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসার প্রশমন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ দগ্ধভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই এমন কচুপোড়া জুটিয়া উঠে নাই। আমি বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে সন্ন্যাসীর কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসী অর্দ্ধদগ্ধ কচু অগ্নি হইতে তুলিয়া তাহার উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলেন; ভিতরে যে সুসিদ্ধ শ্বেত পদার্থ পাওয়া গেল, সন্ন্যাসী তাহাই আমাকে খাইতে দিলেন; আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীকেও কিয়দংশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আহার করিলেন না। খাওয়া উচিত কি না, এবং খাইলে মুখের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়া সম্ভব, এই সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় সন্ন্যাসী তাহা খাইবার জন্য পুনর্ব্বার আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ আর উপেক্ষা করা উচিত নহে, এই মনে করিয়া, আমি সসঙ্কোচে সেই

কচুপোড়ায় দন্তসংযোগ করিয়া তাহার আস্বাদগ্রহণের দুঃসাহস প্রকাশ করিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কচুপোড়ায় অমৃতের আস্বাদন অনুভব করিলাম। এমন সুস্বাদু, মিষ্ট, রুচিকর দ্রব্য আর কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে হইল না; নবনীর ন্যায় সুকোমল, কিন্তু যেন মিছরি-মাখানো, অথচ সেই মিষ্টতায় উগ্রতা নাই। কাহার সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে, আজও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই; তেমন দ্রব্য আর কখনও খাই নাই, সুতরাং তাহার সহিত কাহারও তুলনা করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, কলিকাতায় উৎকৃষ্ট আম্র ও সন্দেশ দ্বারা উত্তম জলযোগ হইতে পারে, যদি কোনও পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক কোনও দিন আমার প্রতি সেইরূপ জলযোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সেই পরমরমণীয় কচুপোড়ার সহিত তাহার এক দিন তুলনা করিয়া দেখি! দুইটি কচুপোড়া (আধসেরেরও অধিক হইবে) ভক্ষণপূর্ব্বক গণ্ডূষে করিয়া নির্ঝরিণীর জল পান করিলাম। মনে হইল, জীবনে আর কখনও এমন তৃপ্তি লাভ করি নাই; এখন মনে হইতেছে, আমার সহৃদয় পাঠকগণকে যদি এই কচুপোড়ার অংশ দিতে পারিতাম, তাহা হইলে অধিকতর পরিতৃপ্ত হইতাম!

সেই বৃক্ষতলে বসিয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীতে কত কথাই হইতে লাগিল। নির্জ্জন মধ্যাহ্ন এবং চতুর্দ্দিক অত্যন্ত স্তব্ধ; শুধু মধ্যাকাশ হইতে এই নিদাঘের মার্ত্তণ্ড ধূসর পর্ব্বতগাত্রে অগ্নিকণার ন্যায় তীক্ষ্ণ কিরণ বর্ষণ করিতেছে, এবং

উত্তপ্ত বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল হিল্লোল বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমি গৃহীও নহি, সন্ন্যাসীও নহি, এবং ধর্ম্মের কোনও নিগূঢ় তত্ত্বও অবগত নহি, অতএব সসম্ভ্রমে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা শুনিতে লাগিলাম। কথা কহিতে কহিতে যখন তাঁহারা একটু চুপ করিলেন, তখন আমার মনে গান গাহিবার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল, আমি সেই মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

"কবে সমাধি হ'বে শ্যামাচরণে"—

গান শেষ হইলে আমি উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, এবং অল্পকাল পরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, এই প্রখর রৌদ্রে বাহির হইবার কোনও আবশ্যক নাই, বিশেষ এখান হইতে একটি ৪ মাইল দীর্ঘ বাঁক আছে; এই পথের মধ্যে একটিমাত্রও বৃক্ষ কিংবা নির্ঝর নাই, সুতরাং যে সকল সাধু সন্ন্যাসী এই পথে বিচরণ করে, তাহারা হয় অত্যন্ত প্রত্যূষে, না হয় অপরাহ্নে, এই পথে বাহির হয়। কিন্তু গন্তব্য পথের মধ্যে বসিয়া থাকা আমার নিকট বিষম বিরক্তিকর; অতএব সন্ন্যাসীর নিষেধসত্ত্বেও আমি রওয়ানা হইলাম; সঙ্গী সন্ন্যাসী বলিলেন, তিনি অপরাহ্নে যাত্রা করিবেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইলাম।

আমি একটি পর্ব্বতের পশ্চিম গা বহিয়া নামিতেছিলাম, সুতরাং পশ্চিম আকাশের সূর্য্য আমার উপর

প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই সন্ন্যাসিকথিত সেই প্রকাণ্ড বাঁক দেখিতে পাইলাম—জ্যা-পথে অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে বটে, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সে পথে যাওয়া অসম্ভব, অতএব পরিধি বেষ্টন করিয়াই যাইতে হইবে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই দেখিতে পাওয়া গেল। রাস্তা যদিও ৪ মাইল কিন্তু দৃষ্টিরোধ করিবার কিছুই ছিল না, বিশেষ পথটি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসাতে তাহার দূরত্ব অধিক বলিয়া বোধ হয় নাই।

গাত্রে ভয়ানক রৌদ্র লাগিতে লাগিল; বৃক্ষলতাহীন; মরুময়, কঠিন প্রান্তরের উপর দিয়া পথ; রৌদ্রতাপে তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে; ইহার উপর স্থানে স্থানে শৈবালের ন্যায় ক্ষুদ্র কণ্টকতরু, এবং ক্রমাগত "চড়াই ও উত-রাই"। কিয়দ্দূর যাইবার পর বুঝিলাম,—বিজ্ঞ, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা অবহেলা করিয়া ভাল কাজ করি নাই। প্রায় এক মাইল যাইতে না যাইতেই আমরা ভয়ানক পিপাসা লাগিল। নিকটে জল পাইবার কোনও উপায়ই নাই। যদি সম্মুখে কোথাও জল পাইবার উপায় থাকে, এই আশায় প্রাণপণে চলিতে লাগিলাম। এক একবার অগ্রসর হই, আর পশ্চাতে ও সম্মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি; কোনও দিকেই জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। সম্মুখে বক্র, দীর্ঘ, সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ, এবং দুই পাশে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ। নিরু-পায় হইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম, পিপাসায় গলা শুকা-

ইয়া গেল; মুখে কিছুমাত্র রস নাই, বুকের মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও চলচ্ছক্তিহীন হই নাই; জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তখনও চলিতেছিলাম, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আর কতক্ষণ চলিতে পারা যায়? ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পদদ্বয় শরীরের ভার বহনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িল। আর দাঁড়াইতে পারিলাম না; গাত্রবস্ত্রখানি সেইখানে ফেলিয়া সেই প্রবল রৌদ্রের মধ্যে শুইয়া পড়িলাম; বুঝিতে পারিলাম, আমার জ্ঞান অপহৃত হইতেছে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আর অধিক ব্যবধান নাই।

পাঠক মহাশয় বিশ্বাস করিবেন কি না, জানি না; না করিলেও তাঁহাদের দোষী করিতে পারি না; তাহার পর যাহা হইল, তাহা সময়ে সময়ে আমার নিকটই অবিশ্বাস্ত বলিয়া মনে হয়, অন্তের ত দূরের কথা। যখন আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত আমার চৈতন্য অপসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় সহসা আমার কর্ণমূলে যেন কাহার নিশ্বাসপতনের শব্দ অনুভব করিলাম। বাতাস ভিন্ন তাহা যে আর কিছু হইতে পারে, তখন তাহা মনে হয় নাই, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! বড়ি পিয়াস লাগা?"—চক্ষুরঃউপর কুয়াশা-জাল বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু এমন সময়ে কর্ণকে কে প্রবঞ্চিত করিবে? জনমানবশূন্য এই ভীষণ পথপ্রান্তে, এই ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে কাহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে আমার

রক্ষাকর্ত্তার আবির্ভাব হইবে?—তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি মরণাপন্ন জীবনের প্রাণপণ শক্তিতে রুদ্ধ-নয়ন ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ বিস্ময় যুগপৎ আমার হৃদয় অধিকার করিল। দেখিলাম, আমার শিরোদেশে সন্ন্যাসী, হস্তে একটি লাল নূতন কমণ্ডলু। আমার ঠিক তথনকার মনের ভাব এখন বর্ণনা করা অসম্ভব, এবং মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় হইয়া তখন কিরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহাও যথাযথ মনে নাই। তবে বোধ হয় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার মনে হর্ষ ও বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি সন্দেহেরও উদয় হইয়াছিল,—হয় ত মনে হইয়াছিল, আমার কল্পনা আমাকে ছলনা করিয়াই নয়নসমক্ষে এই অসম্ভব মরীচিকার বিস্তার করিয়াছে। সন্দেহ ও বিশ্বাসে আমি মুখ বাড়াইলাম, তিনি সেই কমণ্ডলু আমার মুখের কাছে ধরিলেন, আমি এক নিশ্বাসে কমণ্ডলুর সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনও আমি কথা কহিতে সম্পূর্ণ অশক্ত, গভীর ক্লান্তি ও অবসাদ এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয় না। কঠোর পথশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রচুর জল পান করায়, আমার শরীরে সর্দ্দি-গর্ম্মির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম, উঠিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু উঠিতে পারিলাম না, সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল। রৌদ্রের তেজ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলাম; বোধ হইল, তন্দ্রা আসিতেছে। ক্রমে আমার স্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

যখন জাগিয়া উঠিলাম, দেখিলাম, অপরাহ্ণ হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত-গিয়াছে, পশ্চিম আকাশ লোহিতরাগরঞ্জিত, এবং উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে অস্তগত সূর্য্যের আরক্তিম কান্তি শোভা পাইতেছে। উঠিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলাম, কোথাও সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম না।

আর অগ্রসর না হইয়া পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি ব্যগ্রভাবে কুটীরবাসী সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সঙ্গী বলিলেন, আমি চলিয়া যাওয়ার পর এতক্ষণ তাঁহারা বৃক্ষমূলে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন, এইমাত্র তিনি উচ্চ বেদীর পার্শ্বে গিয়াছেন, এবং সন্ন্যাসী কুটীরের দিকে আসিয়াছেন। অধিকতর বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি চলিয়া যাওয়ার পর কুটীরবাসী সন্ন্যাসী আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলেন কি না?" এই বলিয়া তখন আমি সমস্ত কথা তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিলাম; তিনি অল্প হাসিয়া বলিলেন,—"এইসি।"

কুটীরবাসী সন্ন্যাসীকে তখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই। অল্পক্ষণ পরে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাঁহার নিকট কোনও উত্তর পাই নাই।

আমার পর্য্যটনকাহিনীপ্রসঙ্গে আমার বঙ্গীয় বন্ধুমহলে এক দিন আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম; বন্ধুবর্গ

ইহা শুনিয়া যদিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন নাই বটে, কিন্তু গল্পটি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তরে সংক্ষেপে মন্তব্যস্বরূপ বলিয়াছিলাম—

"There are more things in heaven aud earth,
Horatio,—than are dreamt of in your philosophy."

আজ অনেক দিন পরে সেই ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিলাম। জানি, এ বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা প্রলাপোক্তি বলিয়াই বিবেচিত হইবে; কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, যাহা বিজ্ঞানের পরীক্ষাসিদ্ধ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত নহে, সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া কখনও তাহা অবিশ্বাস করি, এবং চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই। তখন সহজেই মনে হয়, আধ্যাত্মিক জগতের বিপুল রহস্য ভেদ করিতে বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; অসীম বিস্তৃত ছায়াপথের অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় যাহা দেশ ও কাল আচ্ছন্ন করিয়া চক্ষুর অগোচর ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ এবং তাহাদের গতির পর্য্যবেক্ষণ করিতে যে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দুর্ব্বল কল্পনায় তাহা আয়ত্ত হইবার নহে।

উত্তর-কাশী।

ভারতবর্ষে বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ। কতদিন এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। পুরাণ অবলম্বন করিলে বলিতে হয়, মানব-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ইহা বর্ত্তমান। যুগান্তর কাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ দিয়া বহু পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাশীর মহিমা এ হিন্দুর দেশে অটল অচলের ন্যায় স্থির, এবং প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ-প্রদীপ্ত তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এখনও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, প্রতিদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে পূতসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুক্তকরে ও একান্তচিত্তে বিশ্বেশ্বরের চরণ-বন্দনা করেন। আবার সন্ধ্যা-কালে যখন ধরাতল ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবৃত হয়, পশ্চিম আকাশের লোহিত রাগ মলিন হইয়া যায়, এবং জাহ্নবীর শান্ত বক্ষে সান্ধ্য-তারকার ম্লান-জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, তখন শঙ্খ, ঘণ্টা ও দামামা-ধ্বনিতে সমস্ত কাশী জাগ্রত হইয়া উঠে, ধূপ-ধুনা এবং পুষ্পরাজির সুগন্ধে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়,

এবং সহস্র সহস্র ভক্তের সুবিমল ভক্তি ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি দেবদেব বিশ্বেশ্বরের মহিমা-দীপ্ত অভয় চরণোদ্দেশে বর্ষিত হয়, তখন বোধ হয়, কোন ভক্তের একবারও মনে হয় না যে, আর একটি দ্বিতীয় কাশী এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের এক প্রান্তে হিমালয়ের সুগভীর প্রশান্ত ক্রোড়ে লুক্কায়িত আছে, এবং সেখানেও বিশ্বেশ্বর এক প্রকাণ্ড পাষাণমন্দিরে স্বমহিমায় জাগ্রতভাবে অবস্থান করিতেছেন।

এই কাশীর নাম উত্তর-কাশী। স্বনামপ্রসিদ্ধ কাশীর সহিত স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ইহার নাম উত্তর-কাশী, কি কাশীর বহু উত্তরে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়া উত্তর-কাশী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কাহার গৌরব অধিক, তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, বিশ্বেশ্বরের প্রিয় পীঠস্থান বলিয়া যদি কাশীর গৌরব হয়, ভগবতী অন্নপূর্ণার লীলাক্ষেত্র অথবা অন্নক্ষেত্র বলিয়া যদি কাশী সম্মানিত হইতে পারে, তবে উত্তর-কাশীও আপনার গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিবার উপযুক্ত। উত্তর-কাশী জননী প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত চারু উপবন, শান্তি ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ। হিমালয়ের কোন্ অজ্ঞাত অংশে কৈলাসধাম সংগুপ্ত রহিয়াছে, কে বলিবে?—কিন্তু কৈলাসনাথের সেই আনন্দ-নিকেতন হইতে উত্তরকাশী কোনও অংশে ন্যূন নহে।

আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই এই কাশীর নাম অবগত আছেন; কারণ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই কাশীর উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। তাহার পর ভারতবর্ষের

এক প্রান্তে অতি দুর্গম প্রদেশে এই তীর্থের অবস্থান, সুতরাং নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটে। যে সকল গৃহী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থই দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকে এখানে আসিবার আশা ত্যাগ করিতে হয়। হিমাচলের পাদদেশে গাড়োয়াল রাজ্য অবস্থিত; তাহার রাজধানী শ্রীনগর হইতে, পাঁচ দিন, সুদীর্ঘ বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অক্লান্তভাবে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে আরোহণ ও অধিরোহণ করিয়া অবশেষে উত্তরকাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়। না দেখিলে এই পথের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পর্ব্বতের উপর দিয়াও সর্ব্বত্র পথ নাই;—কোন স্থানে বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া উপত্যকার এক অংশ হইতে নিম্নতম অংশে অধিরোহণ করিতে হয়, কোথাও পার্ব্বত্য যষ্টির সহায়তায় গভীর অধিত্যকা হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে হয়, কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক হইলেই ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরি-গহ্বরে, কোন অতলস্পর্শে পড়িয়া জীবন্তে সমাহিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব গৃহী দূরের কথা, অনেক সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও সেখানে উপস্থিত হইতে অসমর্থ। শুদ্ধ বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই সেখানে যাওয়া যায় না; প্রাণের একান্ত আগ্রহের সঙ্গে দুইখানি সুদৃঢ় পদ, একটি সবল দেহ এবং উপযুক্ত আহার-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া এই মহাতীর্থদর্শনের কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যই বদরী-নারায়ণ ও কেদারনাথ-দর্শনার্থী সাধু

সন্ন্যাসিগণের অনেকেই গঙ্গোত্রীর পথে আসিতে ভীত ও চিন্তিত হইয়া থাকেন।

উত্তর-কাশী হিমালয়ের নিভৃত-বক্ষে ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে মনে হয়, বুঝি বারাণসীর আর একটি অভিনব দৃশ্যপট এখানে উন্মুক্ত হইবে। সেই পাষাণসোপান-বদ্ধ ভাগীরথীর-তীর ও তরণী-শোভিত তটিনী-বক্ষ, সহস্র সহস্র নরনারী-সঙ্কুল বায়ুপ্রবাহ-হীন প্রস্তর-গৃহ, আবর্জ্জনা-দূষিত পণ্যবীথিকা-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ রাজপথ, এবং বৃষভাবরুদ্ধ সঙ্কীর্ণতর দুর্গন্ধময় শাখাপথ-সমূহ সেইরূপই ইতস্ততঃ প্রসারিত রহিয়াছে;—বুঝি এখানেও কাঁসর-ঘণ্টা-মুখরিত অসংখ্য দেবালয় ও দেবপ্রতিমা, সাধু ও অসাধু, মুমুক্ষু ও অর্থলিপ্সু, সাধ্বী ও পতিতার তেমনি বিচিত্র সম্মিলন।

কিন্তু এখানে উপস্থিত হইলে, তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি সুন্দর, অপাপ-বিদ্ধ পুণ্যতীর্থ স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে অনতি-বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে উত্তর-কাশী প্রতিষ্ঠিত। সেই পবিত্র পীঠতল প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রসন্ন-সলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্য-প্রবাহ অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। চির-তুষার-মণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি যেন মস্তকে শ্বেত-শিরস্ত্রাণ পরিধান-পূর্ব্বক শ্যামল তরুরাজিতে মধ্যদেশ আবৃত করিয়া কোন মহাপুরুষের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত অনুসারে এক স্মরণাতীত যুগ

হইতে বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এই দেবভূমিকে রক্ষা করিতেছে। নিদাঘের খর-রৌদ্রোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন এবং শীতের তুষার-সমাচ্ছন্ন-কুজ্ঝটিকাময়ী হিমযামিনী—সর্ব্বকালেই এক মধুর প্রশান্তিতে এই পুণ্যভূমি পরিব্যাপ্ত থাকে।

উত্তর-কাশী নগর নহে। নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মময় ভাব, আশা-নিরাশা ও সাফল্যনিষ্ফলতার সংঘর্ষণে উৎপন্ন ঘোর আন্দোলন, আর্ত্ত ও পীড়িতের হৃদয়ভেদী ক্ষুব্ধ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, পুরুষকারের বিজয়গর্ব্ব, জেতার দম্ভ এবং আভিজাত্যের অভিমান এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের ক্ষুধিত-তৃষিত কোলাহল, কঠিন পর্ব্বতাবরণ ভেদ করিয়া এই শান্তিধামে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে; নীচতার ধূলি এবং হিংসা-দ্বেষ ও ক্রোধ লোভের জ্বালাময় বায়ুপ্রবাহ এই পবিত্র তীর্থ কলঙ্কিত করে নাই; বিলাস-প্রিয়তা এবং পার্থিব লালসার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে উপস্থিত হইলে শুধু বহু প্রাচীন, নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গল-কিরণানুরঞ্জিত শান্ত আর্য্য-জীবনের একটি সুকোমল পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

অধিবাসীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প,—এক শত ঘরের কিছু অধিক হইবে। নর নারী সকলের প্রকৃতিই অতি মহৎ ও সরল; ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। অতিথির প্রতি ইহাদের অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্বল অতি সামান্য;—কিঞ্চিৎ অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড ও অল্পসংখ্যক গবাদি পশু। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের

কৃপায় নির্ভর করিয়া ইহারা নিশ্চিন্তভাবে দিনপাত করে। এমন পরিশ্রমী, সহজ-সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় জাতি বর্ত্তমান কালে অতি বিরল। পরিশ্রম-বলে ইহারা এই কঠিন পার্ব্বত্য-মৃত্তিকাতে শস্যাদির উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

এখানকার অধিবাসিবর্গ সকলেই ব্রাহ্মণ; ইহাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, প্রকৃতি শান্ত, এবং ব্যবহার অতি মধুর। অধিকাংশ লোকই দেবভাষার সহিত সুপরিচিত। ইহারা গৌরবর্ণ। মধ্যাহ্নে যাঁহারা হলচালন করেন, প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে তাঁহারাই স্থিরগম্ভীরস্বরে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ও মহিম্নঃস্তব পাঠ করিয়া থাকেন। দেববালার ন্যায় সুন্দরী, সুকেশী, আরক্তগণ্ডা, সুলোচনা বালিকাগণ আদিম আর্য্যকন্যার অনুরূপ এখনও গো-দোহন করে, এবং কোমলহৃদয়া স্নেহময়ী রমণীগণ পরম উৎসাহের সহিত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে স্ব স্ব স্বামীর সহায়তা করেন। প্রাচীন কালের এই সকল মোহন-দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে বিমুক্ত দেখিয়া শুধু বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। মনে হয়, ইহা কি ঊনবিংশ শতাব্দী, এবং পাশ্চাত্যসভ্যতাপ্লাবিত ইংরেজের শাসিত ভারতবর্ষ? অথবা বহু শত বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক যুগের এক সুমধুর, প্রীতি-প্রফুল্ল দৃশ্য, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর তটভূমি হইতে সঞ্চয় করিয়া কোন ঐন্দ্রজালিক, তাহার মোহিনী-মায়ার আশ্চর্য্য প্রভাবে, হিমাচলের এই গোপন অন্তরালে সংগুপ্ত রাখিয়াছে, এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সুসভ্য পরিব্রাজকের

কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে একটি অমল সুন্দর বিভ্রম অতীতের একটি ছায়ামুগ্ধ মায়াপুরীর রচনা করিতেছে।

এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা কিংবা পাষাণময় গৃহ একখানিও নাই। গৃহগুলি সমস্তই পর্ণকুটীর,—যেন আদিকালের সেই সকল শান্ত ও সুপরিচ্ছন্ন তপোবন! চতুর্দ্দিকে দুই চারিটি অনুচ্চ দেবমন্দির; মধ্যে জাহ্নবী-কূলে একটি বহু-পুরাতন, দৃঢ়কায়, সমুন্নত পাষাণ-মন্দির, কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া, এবং শত ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, একটি ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গের ন্যায় এই পর্ব্বতোপত্যকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—অভ্যন্তরে বিশ্বেশ্বরের পাষাণমূর্ত্তি। এই মন্দির ও অভ্যন্তরস্থ প্রতিমা নিরীক্ষণ করিলে একবার কাশীর সেই মন্দির ও তাহার দেবতার কথা মনে হয়। কে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক প্রাচীন, বলা যায় না। কাশীর সেই মন্দিরে বাদ্যোদ্যমের তুমুল কলরব, যাজ্ঞিক ও পুরোহিতবর্গের মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ, সমস্ত একত্রিত হইয়া যে মিশ্রিতধ্বনির উৎপাদন করে, তাহা শুনিলে মনে হয়, বিশ্বেশ্বর নিখিলের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণপূর্ব্বক, রাজেন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার মহা-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন; অনুভব হয়, কুবের তাঁহার ধনাধ্যক্ষ, মৃত্যু তাঁহার কিঙ্কর, মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী;—তিনি প্রার্থীকে ধন দিতে-ছেন, স্বাস্থ্য দিতেছেন, ভীত ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইতেছে, অশান্ত-হৃদয় শান্তিধারা লাভ করিয়া পূর্ণ-প্রাণে প্রস্থান করিতেছে ও সকলে "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া

প্রাণ খুলিয়া তাঁহার অভিবাদন করিতেছে। সেই জয়নাদ, সেই প্রীতি ও ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস, সমগ্র ভারতবর্ষে বিকীর্ণ হয়, এবং কাশ্মীর হইতে কুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের ভক্তগণ অধিক আশ্বস্ত-হৃদয়ে, অধিক আগ্রহসহকারে, এই দেবাদিদেবের চরণমূলে আপনাদিগের কাতরপ্রার্থনা নিবেদন করিবার জন্য বারাণসীধামে উপস্থিত হয়।

কিন্তু উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর ভিখারী। তাঁহার দর্শকসংখ্যাও নিতান্ত অল্প; স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ ভিন্ন আর যাহারা তাঁহার দর্শন-কামনায় এই পবিত্র পীঠতলে সমাগত হয়, তাহারা ভিখারী সন্ন্যাসিমাত্র। তাঁহার পূজার স্বুবর্ণনির্ম্মিত বিল্বপত্র তাহারা কোথায় পাইবে? স্বুবর্ণ-কলসে তাঁহার মন্দিরচূড়া বিমণ্ডিত করিবার অর্থ তাহাদের কাহারও নাই; কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তি তাঁহার পাষাণ-মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং সেই ভক্তিই যেন দেব-চরণ হইতে স্বুপবিত্র স্বুধৌত-বেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তদীয় ভক্তের হৃদয়ে বল, সাহস ও মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিতেছে। অর্থগৌরবে কাশীর বিশ্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; কিন্তু উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বরের দরিদ্র ভক্ত-বৃন্দকে ভক্তিতে কে পরাস্ত করিবে?

মন্দিরে কোন প্রকার কারু-কার্য্য নাই। মন্দিরটি কত কালের তাহারও নিরূপণ করা অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থানকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাশীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ,

অনেক প্রকার উক্তি আছে; বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধেও নানা অলৌকিক অখ্যায়িকার অভাব নাই; কিন্তু উত্তর-কাশীর উৎপত্তি, এই বিশ্বেশ্বর-মন্দির ও দেবতার অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ভক্ত-অধিবাসী ও পাণ্ডার হস্তে এই মন্দিরের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা মন্দিরের গৌরববৃদ্ধির জন্য এ পর্য্যন্ত স্বকপোল-কল্পিত কোন গল্পের সৃষ্টি করেন নাই। ইতিহাস তাঁহাদের নিকট মূক, পুরাণের সহিতও তাঁহাদের অধিক পরিচয় নাই, পরিস্ফুট সত্যের ন্যায় এই মন্দির ও তাহার দেবতা তাঁহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান; যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় অবশ্যম্ভাবী, সেই ইচ্ছাময়ের আবির্ভাব ও অবস্থান সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রশ্ন-কৌতূহল তাহাদের মনে স্থান পায় না।

শুনিতে পাওয়া যায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভিন্ন উত্তর-কাশীতে আরও কতকগুলি বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং কাশীর ন্যায় পাষাণবদ্ধ ঘাটেরও অভাব ছিল না; কিন্তু সে সমস্তই ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে। মন্দিরের পূজকগণের অবস্থা অতি হীন, কিন্তু তাঁহারা নির্লোভ,—যাত্রিগণের নিকট তাঁহারা কিছুই প্রার্থনা করেন না, যাত্রিগণ স্বেচ্ছাক্রমে যাহা দান করে, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট। এখানে পাণ্ডাদিগের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। প্রায় অধিকাংশ তীর্থেই দেখা যায়, পাণ্ডাগণ দু' পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনার জন্য যাত্রীদিগের অর্থের উপর

আধিপত্য বিস্তার করে, এখানে সেরূপ কোন উপসর্গ দেখা যায় না। এখানে দুই চারিটি অন্য দেবতার মন্দির থাকিলেও সেই সকল দেবতার পূজা অতি সংক্ষিপ্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি ও প্রীতি, বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন; মন এবং বন হইতেই তাহা সংগৃহীত হয়, অর্থব্যয় অবশ্য প্রয়োজন নহে।

এখানে দুই একখানি দোকান আছে, তাহাতে আটা, চাউল, লবণ এবং লঙ্কা ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। ছাগলের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ইহারা পণ্যদ্রব্যের সংগ্রহ করে, কিন্তু শীতকালে অত্যন্ত শীতে ও তুষারপাতে ইহাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

বৈশাখ মাসই এখানে আসিবার প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে এ পথে পর্য্যটন করা অসম্ভব; তখন গলিত তুষারধারায় পার্ব্বত্য অধিত্যকা সর্ব্বত্রই জলাকীর্ণ হইয়া যায়, প্রস্রবণ সমূহ হইতে প্রবলধারায় জলরাশি নিঃসৃত হইতে থাকে, কঠিন পর্ব্বতগাত্র পিচ্ছিল হওয়াতে তাহা অত্যন্ত দুরারোহ হইয়া উঠে। তাহার পরই দুরন্ত শীতকাল এই গিরিরাজ্য আক্রমণ করে; শুভ্র তুষাররাশিতে সমস্ত প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং তদ্দেশীয় অধিবাসিগণকে কুটীরের মধ্যে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হয়।

কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা অতি মনোহর। এই সময়েও এখানে শীত অতি প্রবল, কিন্তু

তাহা অসহ্য নহে; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই এখানকার বসন্তকাল। বৃক্ষে বৃক্ষে বিবিধ পার্ব্বত্য কুসুমস্তবক বিকসিত হইয়া উঠে, পর্ব্বত্য লতাপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভভার ঢালিয়া দেয়, এবং পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে প্রদীপ্ত সূর্য্যের শুভ কিরণ এই সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভাগীরথীপ্রবাহে, প্রস্রবণসলিলে, এবং পুষ্পদলে অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে; মনে হয়, কঠিন গিরিশৃঙ্গ হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত, নীল, আলোকচ্ছুরিত আকাশ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিপুল মহিমায় উদ্ভাসিত!

উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের একটি সান্ধ্য আরতির বর্ণনা দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় অবসানকাল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন, অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বত্য কৃষককুটীরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অদূরে নদীতীরে বৃক্ষশ্রেণী; অনেকগুলি সাধু, সন্ন্যাসী ও অবধূত সেই শালবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন;—সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া তাঁহারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সান্ধ্যউপাসনা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেই গভীর শব্দ দূর হইতে দূরান্তরে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ ধীরে ধীরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। স্ত্রী পুরুষ অনেককেই সেখানে সম্মিলিত দেখা গেল। সমবেত নরনারীর

সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ;—সেই ক্ষুদ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ তাহাতেই পরিপূর্ণপ্রায়।

পূজা শেষ হইলে দেবতার আরতি হইল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি অজাতশ্মশ্রু বালক ধূপাধার হস্তে লইয়া আরতি আরম্ভ করিল। বালকের আকৃতি এবং প্রকৃতি অতি সুন্দর। মুখমণ্ডল প্রশান্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, কার্য্যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা প্রতিফলিত। এত অল্প বয়সে এমন গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা শুধু সেই জাতির মধ্যেই সম্ভব, যাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভক্তি ও সংযম।

ধূপ দীপ হস্তে উপাসনা করিতে করিতে বালক যে পবিত্র সামগাথা গান করিতেছিল, সেই গানের ও গায়কের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য দর্শকবৃন্দের শ্রবনপথে সুধাবৃষ্টি করিতেছিল। সামগান সাধারণতঃই মধুর ও গম্ভীর,—বালকের কোমল কণ্ঠে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়া তাহা অনির্ব্বচনীয় শুধু অনুভবের যোগ্য; যাহারা সেই দেব সঙ্গীত বুঝিতে পারিল, তাহাদের চক্ষুঃপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল; যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ছল ছল নেত্রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে —চাহিয়া রহিল। সেই অমর-গাথা,—প্রাচীন ঋষি-হৃদয়ের সেই অপার্থিব ভক্তি-ইতিহাস শুনিতে শুনিতে পৃথিবীর কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, এবং অনন্তসুন্দরের দিব্য প্রসন্নতায় বক্ষ ভরিয়া উঠে।

আরতি শেষ হইলে, সকলে অবনত-মস্তকে, ভক্তি পূর্ণ-হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে

প্রত্যাগমন করিল। অধিক রাত্রে চন্দ্র মধ্যাকাশে আসিলে, তাঁহার বিমলকিরণ-ধারায় ভাগীরথী-জল, নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজি, সুবৃহৎ মন্দির ও প্রত্যেক ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর স্নাত হইতে লাগিল। এই সময়ে নদীতীরে প্রস্তর-খণ্ডে উপবেশন করিলে দেখা যায়, বৃক্ষরাজির ঘুমন্ত ছায়া প্রবাহিনীর নির্ম্মল জলে ভাসমান রহিয়াছে; কখন বা মৃদু নৈশ বায়ুর হিল্লোলে একটি শুষ্ক পত্র নদীবক্ষে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; নদীতীরস্থ নানাবর্ণের উপলখণ্ডে প্রতিফলিত চন্দ্ররশ্মি ভাগীরথীতীরকে মন্দাকিনীর মরকত-দীপ্ত উপকূল বলিয়া বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে, এবং বিবিধ পুষ্পের সুবাস বায়ুস্রোতে ভাসিয়া এই ক্ষুদ্র নিভৃত উপত্যকাটিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; বোধ হয়, ঐ সুদূর চন্দ্রলোকের সঙ্গে এই মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, যেন বিশ্বেশ্বরের পূজার জন্য ইহা প্রকৃতি-হস্ত-প্রেরিত অপার্থিব প্রীতি-উপহার। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হয়, চতুর্দ্দিক্ ততই স্তব্ধ ও গম্ভীরভাব ধারণ করে; পর্ব্বত-শ্রেণীকেও নিদ্রিতের ন্যায় বোধ হয়,—শুধু সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে, হিমাচলের সেই স্নেহালিঙ্গন-পাশে, উন্মুক্ত, প্রশান্ত নীলাম্বরতলে একটি উন্নত মন্দির, বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন একটি গিরি-তরঙ্গিণী, নীহারসিক্ত পুষ্পবন, কতকগুলি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও অত্যুচ্চ দেবালয়, একখানি সুচারু দৃশ্য-পটের ন্যায় বিস্তীর্ণ থাকে। নিদ্রালস-নেত্রে তাহার দিকে চাহিলে মনে হয়, এ কি স্বপ্নদৃশ্য,—না, সত্য সত্যই প্রকৃতিদেবীর সযত্ন-অঙ্কিত চিত্রকৌশল?